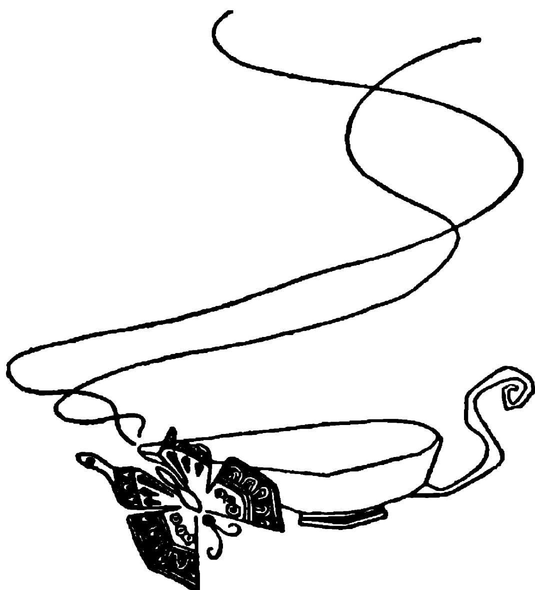


আলোর নেশা

আলোর নেশা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



আর্ট ইউনিয়ন

প্রকাশক ঃ
আর্ট ইউনিয়ন
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থ ও প্রচ্ছদ মুদ্রন, বাঁধাই ঃ
আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট; লিঃ
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ঃ
প্রণব বিশ্বাস

ব্লক ঃ
রিপ্রোডাকসন সিনডিকেট

পরিবেশক ঃ
দি কাল্‌চার

দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সূচীপত্র



—:)০(:—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বহু সাহিত্যিকের সাধনার উপাদান নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই সাহিত্য সাধনায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিরাট অংশ গ্রহণ করে আসছেন। তার লেখা ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের এক একটি অমূল্য সম্পদ। "আলোর নেশা" গ্রন্থটিতে সেইরূপ কয়েকটি অধুনা-লুপ্ত গল্পের একত্র সমাবেশ করা হয়েছে। গল্পগুলি আজ থেকে বহু দিন পূর্ব্বে লেখা হয়েছে তবু আজও এর মধ্যে এক নতুনত্ববোধ রয়েছে। তাই আশা করি এই বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত গল্পগুলি আজও সাহিত্যরসিকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

বৈশাখ, ১৩৬৫ —প্রকাশক

/আলোর নেশা

আমরা 'আরও আলো', 'আরও আলো' করিয়া গেটের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু হঠাৎ তীব্র আলোর সাক্ষাৎকার ঘটিলে চট্ করিয়া চোখ বুজিয়া ফেলি। অনাবৃত আলোকের উগ্র দেবসুরা আকণ্ঠ পান করিতে পারি না ; নেশা হয়, টলিতে টলিতে আবার নর্দ্দমার অন্ধকারে হোঁচট্ খাইয়া গিয়া পড়ি। আলোকের ঝরণা-ধারায় ধৌত হইবার প্রস্তাবটা মন্দ নহে, কিন্তু ঝরণার তোড়ে ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা আছে কি না, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

একরাশ এলোমেলো উপমার মধ্যে আসল কথাটা জট পাকাইয়া গেল। ইহাকেই বলে ধান ভানিতে শিবের গীত।

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রণয়-ব্যাপার ঘটিয়াছে, অন্ততঃ যে-সব প্রণয় ব্যাপারের লিপিবদ্ধ ইতিহাস আছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পনের আনা ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকাকে কোনও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এই প্রথাটির অনেক সুবিধা আছে,—এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারা যায়। নায়ক বীর, নায়িকা কোমলাঙ্গী, ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা একসঙ্গে বলা হইয়া যায়। তাই, আমারও লোভ হইতেছে যে, এই চিরাচরিত সুন্দর প্রথাটি অবলম্বন করিয়া গল্প আরম্ভ করি। কিন্তু একটা বড় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। অন্য সময় যাহা খুসী বলিতে পারি, কিন্তু গল্প বলিতে বসিয়া নিছক সত্য কথা বলিতেই হইবে, এমন কি, রসের রসান পর্য্যন্ত দেওয়া চলিবে না,—ইহাই আধুনিক সাহিত্য-কলার নব-ন্যায়। সুতরাং সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে নায়িকাই নায়ককে (প্রথমে বিপদে ফেলিয়া) বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

নায়কের নাম হারাণ। হারাণ নাম শুনিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিবেন না। সে বাঙ্গালী যুবক-সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিমান নমুনা,—অর্থাৎ তাহাকে দেখিলেই বাঙ্গালী যুবক বলিতে কি বুঝায়, তাহা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লওয়া যায়। সে কলেজে পড়ে, সে রোগা ও কালো, লম্বাও নহে, বেঁটেও নহে। সে বুদ্ধিমান কিন্তু বুদ্ধির লক্ষণ মুখে কিছু প্রকাশ পায় না। মুখখানি ঈষৎ শীর্ণ, চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ সঙ্কোচের ভাব; কখনও কখনও আঘাত পাইয়া তাহা রূঢ়তার শিখায় জ্বলিয়া উঠে। বাঙ্গালীর মজ্জাগত অভিমান— sensitiveness চারিদিক হইতে খোঁচা খাইয়া যেন একই কালে ভীরু এবং দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষার ধারা যে পথে গিয়াছে, সহবৎ সে পথে যাইতে পারে নাই—তাই মনটা তাহার আশ্রয়হীন নিরালম্ব হইয়া আছে।

হারাণ মেসে থাকিয়া কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। বয়স কুড়ি। তাহার বাবা গোয়ালন্দ জাহাজ অফিসের হেড্‌ক্লার্ক। হারাণ বি-এ পাশ করিলেই বাবার অফিসে ঢুকিবে এইরূপ একটা কথা স্থির হইয়া আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সে লেকএ বেড়াইতে যাইবে না, এমন কোনও কথা নাই। আমি জোর করিয়া বলিতেছি, সে লেকএ বেড়াইতে গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঢোল হইয়া বাসায় ফিরিতেছিল। সঙ্গে ছাতা ছিল না।

ইহার অপেক্ষাও পরিতাপের বিষয়, তাহার পকেটে পয়সা ছিল না। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যায় হাতে ছাতি ও পকেটে পয়সা না লইয়া যে ব্যক্তি পথে বাহির হয়, তাহার মত 'নিরেট' পৃথিবীতে আর কয়জন আছে? তবে সত্য কথাটা বলিতেই হইল। হারাণের বাবা তাহাকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন বটে, কিন্তু তাহার ছাতা ছিল না। ছাতাটা গত বর্ষায় ছিঁড়িয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে লেকএ বেড়াইতে যাইবে না? এ যে বড় অন্যায় কথা।

জলে ভিজিয়া হারাণের চেহারা হইয়াছিল একটি সিক্ত মার্জ্জারের মত। সে চুপসিয়া একবারে আধখানা হইয়া গিয়াছিল—কাপড় ও কামিজ গায়ে জুড়িয়া গিয়াছিল, জুলপি হইতে জল গড়াইয়া চিবুক বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। বৃষ্টি তখনও থামে নাই, তবে বেগ অনেকটা কমিয়া ছিল; তাহারই মধ্যে ভিজা ভারি জুতায় নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে সে চলিয়াছিল।

কিন্তু যাইতে হইবে অনেক দূর,—সহরের অন্য প্রান্তে। একটা রিকশ'র ঝুনঝুনি পর্য্যন্ত কোথাও শুনা যাইতেছিল না। যে পথ দিয়া হারাণ চলিয়াছিল, সেটা সাধারণতঃ একটু নির্জ্জন, এখন বৃষ্টির প্রভাবে একবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল।

একটা ছোট চৌমাথা পার হইতে গিয়া তাহার বিপদ উপস্থিত হইল। রাস্তার মাঝামাঝি পিছন হইতে মোটর-হর্ণের অধীর চীৎকার শুনিয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মোটরখানা তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই পা পিছলাইয়া গেল, সে চিৎ হইয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল।

মোটর-চালক ঠিক সময়ে মোটর রুকিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু স্কিড্‌ করিয়া গাড়ীখানা প্রায় গজ দুই অগ্রসর হইয়া গেল। চিৎ-পতিত হারাণ দেখিল, সে মোটরের তলায় বিরাজ করিতেছে।

মোটরের ভিতর হইতে একটি ভয়সূচক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল। গাড়ীর আরোহিণী চালকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিল, হারাণ সরীসৃপের

মত কোনও প্রকারে মাথাটি গাড়ীর তলা হইতে বাহির করিয়া সম্মুখের নম্বর প্লেটের পানে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া আছে।

গাড়ীর সোফার এতক্ষণে নিঃশব্দে নিজের ন্যায্য স্থানে আসিয়া বসিয়াছিল, আরোহিণী বিপন্নকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল,—"প্যারে, জলদি আও।"

প্যারে ও আরোহিণী দুজনে মিলিয়া নম্বর প্লেট পাঠনিরত হারাণকে তলা হইতে টানিয়া বাহির করিল। হারাণের লাগে নাই, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজ্ বিজ্ করিয়া বলিল—"থ্রি সেভন্ নাইন ফোর টু।"

আরোহিণী ও সোফার মুখ-তাকাতাকি করিল। সোফার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পুলিস বা অন্য কেহ কোথাও নাই। সে পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিল।

আরোহিণী কিন্তু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, একটা লোককে চাপা দিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে প্রস্থান করিতে বোধ হয় বিবেকে বাধিল। সোফার জাতীয় জীবের বিবেক বলিয়া কিছু নাই।

আরোহিণী জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার লাগে নি ত?"

হারাণ চমকিয়া উঠিল; দেখিল, একটি নব-যুবতী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। সে যেন আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল,—"অঁ্যা। না না, লাগেনি।" তার পর আর কোনও কথা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল,—"থ্রি সেভন নাইন ফোর টু।"

নব-যুবতীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, সে বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিই।"

হারাণ বলিল,—"না না, দরকার নেই—"

এই সময় বিবেকহীন সোফারটা দূরে এক জন লোক আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিল,—"আইয়ে বাবু, জলদি ভিতর আইয়ে।"

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হারাণ গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিল, নব-যুবতীটি তাহার পাশে বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হারাণ মনে মনে 'না না না' বলিতেছিল, কিন্তু তাহা কেহ শুনিতে পাইল না।

নবযুবতী সোফারকে বলিল,—'ঘর চলো।' তার পর হারাণের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"আপনি ঠিক বলছেন আপনার লাগে নি?"

হারাণ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

যুবতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"যাক, তবু ভাল। আমার এমন ভয় হয়েছিল—"

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না; হারাণের অঙ্গ নির্গলিত জল মোটরের ভিতরটা ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিল। হারাণ কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার বাড়ী কোন্ দিকে?"

হারাণ বাসার ঠিকানা দিল; যুবতী বলিল,—"আমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে প্যারে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে।" তার পর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—"আপনি এমন হঠাৎ প'ড়ে গেলেন যে, গাড়ী থামানো গেল না। আচ্ছা, কে মোটর চালাচ্ছিল আপনি দেখেছিলেন কি ?"

হারাণ মাথা নাড়িল, এ প্রশ্নের মানেই বুঝিতে পারিল না।

গাড়ী আসিয়া চক্রবেড়ে রোডের কাছাকাছি একটা বড় বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীর ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে। যুবতী নামিয়া পড়িয়া বলিল,—"আচ্ছা, আপনাকে তা হলে পৌঁছে দিক—"

হারাণও নামিবার উপক্রম করিতেছিল, যুবতী বলিল,—"না না, আপনি নামবেন না, please। প্যারে, বাবুকো মোকাম পোঁছাও।" তার পর গাড়ীর মধ্যে গলা বাড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "I am very sorry for the accident—I hope you understand ?—আচ্ছা—Good night !" বলিয়া হাসিয়া একবার নড্ করিয়া দ্রুত পদে গৃহে প্রবেশ করিল। বৃষ্টি এ-দিকটায় তখন থামিয়া গিয়াছিল।

যথাসময় হারাণ মোটর চড়িয়া বাসায় গিয়া পৌঁছিল।

অতঃপর হারাণের মনের ভাব যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে এ কাহিনী শেষ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হয়। হিমাদ্রিশৃঙ্গে যেদিন অকস্মাৎ আসন্ন আষাঢ় নামিয়া আসে, সে দিন শিলাসঙ্কীর্ণ পথে রুদ্ধবেগে স্রোতস্বিনীর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার যথার্থ বিবরণ দান করা সকলের কর্ম্ম নহে। আমি কেবল এইটুক বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে হারাণ সে রাত্রিটা জাগিয়াই কাটাইয়া দিল।

পরদিন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় একটি ভদ্রলোক মেসে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইংরাজী বেশে সুসজ্জিত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, চাল-চলনে একটা গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব আছে; তাঁহাকে দেখিয়াই হারাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হারাণ তখন স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, ভদ্রলোক পাঁশনে চশমার ভিতর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"আপনিই কাল রাত্রে মোটর চাপা পড়েছিলেন ? আমার মেয়ে মিণ্টু গাড়ীতে ছিল, তারই মুখে শুনলুম। আমার নাম শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ভট্ট।"

ঘরে একটি মাত্র চেয়ার ছিল, হারাণ তাড়াতাড়ি তাহা অগ্রসর করিয়া দিল। হেমেন্দ্র বাবু তাহাতে উপবেশন করিয়া কার্ডকেশ হইতে কার্ড বাহির করিয়া হারাণের হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমাকে বোধ হয় আপনি চেনেন না।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে একট কৃপার আভাস পাওয়া গেল।

হারাণ কার্ড পড়িয়া দেখিল, হেমেন্দ্র বাবু বড় কেও-কেটা নন, হাইকোর্টের এক জন মস্ত চাকরে; বোধ হয় দুই-আড়াই হাজার টাকা মাহিনা পান। হারাণ

কার্ডখানি সসম্ভ্রমে হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমেন্দ্র বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"কালকের ঘটনা যে রকম শুনলম, তাতে আপনারই দোষ দেখা যাচ্ছে।"

হারাণের বুক ঢিব-ঢিব করিয়া উঠিল। যে দোষী তাহার দণ্ড হইয়া থাকে, হেমেন্দ্র বাবু হাইকোর্টের মস্ত লোক; তবে কি তিনি হারাণের দণ্ড বিধানের জন্যই আসিয়াছেন?

হেমেন্দ্র বাবু পুনশ্চ বলিলেন,—"এ রকম বেপরোয়াভাবে পথচলা উচিত নয়, সকলেরই সিভিক-ডিউটি আছে। (হারাণ স্পন্দিত-বক্ষে ভাবিল—সিভিক-ডিউটি কাহাকে বলে?) ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে পথ চলবেন।"

হারাণ ক্ষীণস্বরে বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

হারাণকে পুরাদস্তুর ভয় পাওয়াইয়া হেমেন্দ্র বাবু ঈষৎ সদয়কণ্ঠে বলিলেন,—"যা হোক, আপনার যে আঘাত লাগেনি এই যথেষ্ট। আমার মেয়ে মিণ্টু একটু চিন্তিত হয়েছিল, সেই আমাকে আপনার খোঁজ খবর নিতে পাঠালে। আপনার নামটি কি?"

বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে হারাণ বলিল,—"শ্রীহারাণচন্দ্র লাহিড়ী।"

হেমেন্দ্র বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"কোর্টে যাব বলে তৈরী হয়ে বেরিয়েছি, on the way আপনাকে দেখে গেলুম।" তার পর লৌকিক শিষ্টাচার অনুযায়ী বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি খুসী হলাম,—আমার বাড়ীতে যদি কখনও যান, আরও খুসী হব।" বলিয়া আঙুল তুলিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তার পর কি হইল? এইখানেই ত এ ব্যাপার শেষ হইবার কথা। গরুর গাড়ীর চাকার সহিত দৈবক্রমে পুষ্পক-রথের মাড্-গার্ডের ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়াছিল, তাহাতে গরুর গাড়ীর ত জখম হইবার কথা নহে। অথচ—

ফিল্-আপ্-দি-ব্ল্যাঙ্ক্স্ নামক যে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের ঠকাইয়া থাকেন, সেইরূপ একটি ধাঁধাঁর অবতারণা এখানে করা দরকার। কারণ হারাণের ন্যায় লোকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার মত ক্লান্তিকর কাজ আর নাই। মৌখিক শিষ্টাচার ও আন্তরিক নিমন্ত্রণে কি তফাৎ তাহা হারাণ বুঝিত না; অবশ্য অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও যে সব সময় ধরিতে পারেন না, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। ধমক দিয়া ফরিয়াদীকে আসামী করা যায়, এ তত্ত্বও সকলের সুবিদিত নহে। তাহার উপর, যে নব-যুবতীটির নাম মিণ্টু সে হারাণের জন্য চিন্তিত হইয়াছিল, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (এক দিকে সঙ্কোচ-জড়তা Inferiority Complex, অপর দিকে দুর্নিবার্য্য বাসনা,—এই দুই পক্ষে দেব-দানবের দড়ি টানাটানি;)—এক কথায় হারাণের মনস্তত্ত্বরূপ নীরস

সমস্যার পাদপূরণের ভার পাঠকের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা পূরা এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে এক দিন বৈকালে হারাণ গুটি গুটি হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বুকের ধড়ফড়ানি চাপিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কোথায় ?"

দারোয়ান অফিস ঘর দেখাইয়া দিল। হারাণের ইচ্ছা হইল, এখান হইতেই পলায়ন করে ; আর পা উঠিতেছিল না। তবু সে জোর করিয়া অফিস-রুমে ঢুকিয়া হেমেন্দ্র বাবুকে একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

হেমেন্দ্র বাবু চিনিতে না পারিয়া ঈষৎ ভ্রকুটি করিয়া রহিলেন ; প্রথমটা ভাবিলেন, তাঁহার অফিসের কোনও ছোক্‌রা কেরাণী, হয় ত কোনও বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। তার পর হঠাৎ চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"ওঁ! You are the young man whom—, মনে পড়েছে। তার পর খবর কি ? বসুন।"

হেমেন্দ্র বাবু একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন ; মিণ্টুর অবৈধ গাড়ী চালানোর ফলে যে ক্ষুদ্র ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে মিটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া তাহার হিসাব তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন হারাণকে পুনরায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন,—"আবার কি হ'ল ?"

হারাণ উপবিষ্ট হইলে, দু'একটা সাধারণ কথার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি খবর বলুন ত? আমার সঙ্গে কি কোন দরকার আছে ?"

একটা কোনও দরকারের কথা আবিষ্কার করিতে পারিলে বোধ করি হারাণ বাঁচিয়া যাইত ; সে সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "না—আমি এমনি দেখা করতে এসেছি।"

"Social call! ও—তা বেশ বেশ,"—মুখে উৎফুল্লতার ভাব আনিয়া হেমেন্দ্র বাবু দ্বিধাভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"আসুন, ড্রয়িংরুমে গিয়া বসা যাক।" বলিয়া পাশের দরজা দিয়া হারাণকে একটি চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেলেন।

ড্রয়িংরুমে মিণ্টু বাহিরে যাইবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়াছিল, হেমেন্দ্র বাবু কন্যাকে সম্বোধন করিয়া একটু অস্বাচ্ছন্দ্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"মিণ্টু, দেখ ত এঁকে চিনতে পার কি না ?" আসলে হারাণের নামটা তিনি কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

পিতার চেয়ে মিণ্টুর স্মরণশক্তি বেশী, সে তাহার সহাস্য চোখ দুটি তুলিয়া বলিল,—"চিনেছি বৈ কি, উনি ত হারাণ বাবু!"

হারাণ একটা অনভ্যস্ত আড়ষ্ট নমস্কার করিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

শিক্ষা ও আবহাওয়ার গুণে মিণ্টু বাহিরে একটু চপল ও তরলস্বভাব হইয়া পড়িলেও তাহার মনের ভিত্তিটা সরল ও সাদাসিধাই রহিয়া গিয়াছিল। আলোর সমুদ্রে সে মনের সুখে সাঁতার কাটিতেছিল, নিম্নের অতলে যে সব দংষ্ট্রাকরাল ক্ষুধিত জীব ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তখনও হয় নাই। সে ভারি সুন্দরী, সবেমাত্র আঠারোয় পা দিয়াছে; রূপ, যৌবন, শিক্ষা, মিষ্ট স্বভাব, ধনী বাপ ইত্যাদি নানা কারণ মিলিয়া সে উচ্চ সমাজের মধ্যে পরম লোভনীয় belleএর আসনে অধিষ্ঠিত হইবার উপক্রম করিতেছিল।

হারাণের সঙ্গে সে বেশ সহজ সহৃদয়তার সঙ্গেই কথা আরম্ভ করিল, কিন্তু হারাণ এমনি মূক বধির প্রাণীর মত বসিয়া রহিল যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। হারাণ অনেক চেষ্টা করিয়াও না পারিল ভাল করিয়া মিণ্টুর মুখের পানে চাহিতে, না পারিল গুছাইয়া দুটো কথা বলিতে। হাঁ না—এই একাক্ষর শব্দ দুটো ছাড়া তাহার মুখ দিয়া আর বিশেষ কিছু বাহির হইল না। অথচ গত সাত দিন ধরিয়া সে কতই না সঙ্কল্প করিয়াছিল।

মিনিট পনের পরে হেমেন্দ্র বাবু আলস্যভরে একটা হাই চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই হারাণও চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আমি তা হ'লে আজ—"

মিণ্টুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বলিল,—"চললেন? আচ্ছা, আবার আসবেন।"

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পর পিতা ও কন্যা কিছুক্ষণ পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর হেমেন্দ্র বাবু মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বিরসকণ্ঠে বলিলেন,—Poor fellow! He was out of his depth here. I wonder why he came.

মিণ্টু হাসিয়া বলিল, "জড়-ভরত গোছের লোক—না? এই জন্যেই বোধ হয় সেদিন মোটর চাপা পড়েছিল।"

হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"বুদ্ধি-সুদ্ধি বিশেষ আছে ব'লে ত বোধ হয় না। বললে বি, এ পড়ে; পড়ে হয় ত! কিন্তু কি যে পড়ে তা ভগবানই জানেন।" বলিয়া উদাসভাবে হাতটা উল্টাইলেন।

মিণ্টু কব্জির ঘড়ী দেখিয়া বলিল,—"বাবা আমি চললুম, আমার already দেরী হয়ে গেছে। ছটার আগে মিসেস সিনহার বাড়ীতে পৌঁছুবার কথা।"

হেমেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "একলা যাচ্ছ? তোমার মা যাবেন না?"

"মা'র মাথাটা ধরেছে, তিনি যেতে পারবেন না।" সকৌতুকে ভ্রূতুলিয়া

কহিল,—"আমার কি আবার স্যাপেরোণ দরকার না কি ? বাবা, তুমি দিন দিন একদম সেকেলে হয়ে যাচ্ছ।"

হেমেন্দ্র বাবু কন্যার চেহারাখানি একবার আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা যাও, কিন্তু নিজে ড্রাইভ্ করো না যেন। একে তোমার লাইসেন্স নেই, তার ওপর আবার কোন হারাণকে চাপা দিয়ে বসে থাকবে।"

মিণ্টু হাসিয়া বলিল,—"ভয় নেই, একটি হারাণকে চাপা দিয়েই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।"

ওদিকে বুদ্ধিহীন এবং জড়ভরত হারাণের অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। মিণ্টুকে সে মুখ তুলিয়া দেখে নাই বটে, কিন্তু দু'একবার আড়-চোখে যতটুকু দেখিয়াছিল তাহাতেই তাহার সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রবল স্রোতের টানে অপটু সন্তরণকারী যেমন কখনও ভাসিতে ভাসিতে, কখনও ডুবিতে ডুবিতে বহিয়া যায়, সেও তেমনিই অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিল। একূল ওকূল কোনও কূলেই যে সে কোনও দিন উঠিতে পারিবে এমন আশা রহিল না।

হারাণ হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ী রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিল ; কোনও হপ্তায় দু'বারও যাইতে লাগিল। কিন্তু তবু তার মুখে ভাল করিয়া কথা ফুটিল না। সে মুগ্ধের মত—মূঢ়ের মত ড্রয়িংরুমে বসিয়া থাকিত ; মিণ্টুর হাসি-কথা শুনিত। যখন অন্য লোক কেহ থাকিত তখন সে দ্বিগুণ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত, সুবিধা পাইলে পলাইয়া আসিত। তাহাকে লইয়া অন্য সকলের মধ্যে যে নেপথ্যে মুচ্‌কি হাসি ও চোখ-টেপাটিপি চলিত তাহা দেখিবার মত চক্ষু তাহার ছিল না। বস্তুতঃ এই একান্ত অপরিচিত সমাজের লোকেরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে তাহা সে কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই, বুঝিতেও পারে নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে মাঝে মাঝে ঈর্ষার তীক্ষ্ণ সূচীবেধ অনুভব করিত। কোনও যুবক—হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যুবকদের গতায়াত সম্প্রতি খুব বাড়িয়া গিয়াছিল—মিণ্টুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে হাসি-গল্প করিতেছে দেখিলেই তাহার গায়ে কাঁটার মত ফুটিত। কিন্তু বদনমণ্ডল যাহার ভাব-লেশহীন ও মুখে যাহার কথা নাই, তাহার মনোভাব কে বুঝিবে ? তবু কেহ কেহ যেন আন্দাজ করিয়াছিল।

একদিন হারাণ উঠিয়া যাইবার পর মিণ্টুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁরে, ও ছেলেটা কি জন্যে আসে বল্ ত ? কথাও কয় না, কেবল জড়সড় হয়ে ব'সে থাকে—কি চায় ও ?"

মিণ্টু হাসিতে লাগিল, ইংরাজীতে যাহাকে giggle বলে সেই ধরণের হাসি ; শেষে বলিল,—"জানি না।"

সেই দিনই দৈবক্রমে হারাণের সহিত একজন পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়া গেল। হারাণ হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে পড়িয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল,—"আরে! কে ও, হারাণ না কি?"

হারাণ পিছু ফিরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—"খগেন।"

খগেন গোয়ালন্দের স্কুলে সহপাঠী ছিল। খগেনের মত সুন্দর চেহারা বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহেবদের মত টকটকে রঙ, একহারা লম্বা চেহারা, মুখখানা যেন গ্রীক শিল্পী বাটালি দিয়া কুঁদিয়া বাহির করিয়াছে; মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, চোখের মণির মধ্যে যেন আগুন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঠোঁট দুটি পাকা বিম্বফলের মত লাল।

কিন্তু তবু তাহার চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল—যাহা মানুষকে আকর্ষণ না করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিত। বোধ হয়, তাহার চোখের দৃষ্টি ও অধরের ভঙ্গিমার এমন একটা নির্ম্মম বুদ্ধি ও আত্মপ্রধান দাম্ভিকতা ফুটিয়া উঠিত যে, লোক সঙ্কোচে তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাইত। হারাণের সঙ্গেও তাহার বন্ধুত্ব ছিল না, কেবল পরিচয় ছিল। খগেন বড়লোকের ছেলে, সে হারাণকে চিরদিনই নিরতিশয় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিত। তা ছাড়া, চরিত্রগত প্রভেদও এমনই দুর্লঙ্ঘ্য ছিল যে প্রীতির ভাব জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। স্কুলে পাঠ কালেই খগেন একটি মাষ্টারের কন্যাকে লইয়া যে কাণ্ড করিয়াছিল,—নেহাৎ বড়মানুষের টাকার জোরেই ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, অন্যথা একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হইয়া যাইত।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া দু'জনেই কলিকাতায় আসিয়াছিল; এ কয় বছরে দুই তিনবার পথে ঘাটে দেখাও হইয়াছিল; কিন্তু খগেন যে হারাণকে চেনে ইতিপূর্ব্বে একবার ঘাড় নাড়িয়াও তাহা স্বীকার করে নাই।

খগেন এখন হারাণের দিকে সহাস্যে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"কি হে, ব্যাপার কি? আজকাল খুব high circle এ move করছ দেখছি।" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উল্টাইয়া হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীর দিকে নির্দ্দেশ করিল।

হারাণ এই অযাচিত সহৃদয়তার কিছুকাল বিস্মিত হইয়া থাকিয়া বলিল,—"না—হ্যাঁ, ওঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে—"

"তা ত বুঝতেই পারছি। Lucky old dog!" বলিয়া খগেন মুরুব্বীর মত তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিল।

দুজনে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হারাণ একটু শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ওদের চেন না কি?"

খগেন বলিল,—"পরিচয় নেই, তবে মুখ চিনি। হেমেন্দ্রবাবু is one of the leaders of enlightened society, বলতে গেলে নব্য সমাজের মাথা। আর তাঁর মেয়ে মিণ্টু, she is a peach."

হারাণের মুখখানা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; খগেন তাহার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কথা ফিরাইয়া বলিল,—"তার পর, তুমি আছ কোথায়? প্রায়ই মনে করি তোমার সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু ঠিকানা জানি না ব'লে হয়ে ওঠে না। আমি এই কাছেই ভবানীপুরের দিকে থাকি। চল না, বাসাটা ঘুরে আসবে।"

হারাণ বলিল,—"না আজ থাক। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি সিনেমায় যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই, just to kill time. কলকাতায় এসে বন্ধুবান্ধব বড় একটা জোটেনি—যারা জুটেছিল তারা, you know the sort, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে ফূর্ত্তি চালাতে চায়। I have choked them off,—তাই একলা প'ড়ে গেছি। তা চল না, একসঙ্গে সিনেমাই দেখা যাক; বেশ ভাল জিনিষ, Fox Production."

হারাণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"না ভাই আমি এখন বাসায় ফিরি। একটু কাজ আছে—"

খগেন পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিল,—"Right O! business first, কিন্তু তোমার ঠিকানা ত বললে না।"

হারাণ ঠিকানা দিল। তখন খগেন সহাস্য-মুখে 'টা-টা' বলিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অলস-পদে ভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

দিন দুই পরে খগেন হারাণের বাসায় গিয়া দেখা দিল। বিকেলবেলা হারাণ কলেজ হইতে ফিরিয়া ষ্টোভে চা তৈয়ার করিতেছিল, চার পয়সার জলখাবার ঠোঙ্গায় করিয়া টেবিলের উপর রাখা ছিল, খগেনকে দেখিয়া সে তটস্থ হইয়া উঠিল। খগেন ঘরে ঢুকিয়া একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল; নিরাভরণ ঘর, একটা তক্তপোষ, একটা কাঠের আসনযুক্ত চেয়ার ও একখানা কেরোসিন কাঠের টেবল—ইহাই ঘরের আসবাব। ঘরের এক কোণে দুই দেওয়ালে দড়ি টান করিয়া কাপড়-চোপড় রাখবার ব্যবস্থা। বইগুলি টেবলের উপরেই থাক্ করিয়া সাজানো; তক্তপোষের নীচে কাদা-মাখা জুতা যেন লজ্জিতভাবে আশ্রয় লইয়াছে। খগেনের ঠোঁট নিজের অজ্ঞাতসারে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসিয়া হাতের ছড়িটা টেবলের উপর রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "Plain living and high thinking! বেশ বেশ! চা হচ্ছে না কি? আমাকেও এক পেয়ালা দিও।"

হারাণ তাড়াতাড়ি আরও কিছু জলখাবার আনাইল। তার পর দুই জনে কলাই-করা পেয়ালার চা পান করিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া খগেন নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল; ত্রুটি-কুণ্ঠিত অস্বচ্ছন্দভাবে হারাণও কথাবার্ত্তা কহিতে

লাগিল বটে, কিন্তু তাহার এই শ্রীহীন দারিদ্র্যের মধ্যে সুবেশ, সুন্দর ও পরিমার্জ্জিত খগেনকে যে নিতান্ত বেমানান্ ঠেকিতেছে, ইহা সে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিল।

খগেন হঠাৎ এক সময় বলিল,—"কি হে, তোমাকে detain করছি না ত? তোমার কোথাও engagement থাকে ত বল।"

হারাণ অকারণ লজ্জিত হইয়া বলিল,—"না না, আমি ত রোজ ওখানে যাই না—মাঝে মাঝে—"

খগেন বলিল, "The lady protests too much! তুমি দেখছি বেজায় shy, আমার কাছে অত লুকোচুরি নাই বা করলে! যাবে ত চল—আমিও ঐদিকেই যাব, একসঙ্গে যাওয়া যাক।"

একবার একটু প্রলোভন হইলেও ভিতরে ভিতরে হারাণের মনটা বাঁকিয়া বসিল। খগেন যে কিসের জন্য টোপ ফেলিতেছে, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিলেও একটা আশঙ্কা তাহাকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল,—"না, আজ আর যাব না।"

খগেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া—"আচ্ছা, আমি তবে চললুম" বলিয়া একটু যেন বিরক্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

খগেনের আসা-যাওয়া কিন্তু বন্ধ হইল না, সে প্রায়ই হারাণের বাসায় আসিতে লাগিল। ভাবে ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে ইসারা দিলেও সে যে হারাণের কাছে কি চায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কিন্তু তাহার আত্মসম্মানে বাধা পাইতে লাগিল। সে হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, মিণ্টুর বিষয়ে দু'একটা ঠাট্টা-তামাসাও করিত, কিন্তু হারাণ এমনই নিরেট নির্ব্বোধের মত বসিয়া থাকিত যে কথাটা অগ্রসর হইতে পাইত না। এক দিন এই ধরণের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতেই হারাণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা খগেন,—কিছু মনে করো না—তোমার আগেকার অভ্যেসগুলো এখনও আছে কি?"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া খগেন বলিল, "আগেকার অভ্যেসগুলো—O—you mean—those!"

খগেন উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল—"My dear boy, তুমি কি মনে কর আমি একটা saint? Young blood must have its way, lad, and every dog his day! তোমার মতন কেবল বই প'ড়ে আর কলেজ গিয়ে যৌবনটা বরবাদ ক'রে ফেলতে ত পারি না।"

হারাণ অস্বস্তি-পূর্ণ হৃদয়ে চুপ করিয়া রহিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। প্রশ্নটা উত্থাপন করিবার সাহস সে কোথা হইতে পাইল তাহাই যেন বুঝিতে পারিল না।

উঠিবার সময় খগেন বলিল,—"ভাল কথা, কাল রাত্রে আমার বাসায় তোমার ডিনারের নেমতন্ন রইল। আমি এতবার তোমার বাসায় এলুম আর তুমি একবারও return visit দিলে না—this is extremely rude of you !"

হারাণ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু খগেন বলিল,—"সে হবে না, ওজর আপত্তি শুনছি না—বুঝলে ?" বলিয়া হারাণকে রাজি করাইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর খগেনের ঠিকানায় গিয়া হারাণ দেখিল—চমৎকার ছোট একটি বাসা; নীচে বসিবার ঘর ও ডাইনিং রুম, উপরে শয়ন-কক্ষ, পড়িবার ঘর ইত্যাদি। খগেন তাচ্ছিল্যভরে সমস্ত দেখাইয়া বলিল,—"সত্তর টাকা এই বাড়ীটার জন্যে ভাড়া দিই। কিন্তু বাসাটা আমার পছন্দ নয়। একলা থাকি বটে, তবু যেন কুলোয় না। ভাবছি একটা ভাল বাসায় উঠে যাব।"

বাড়ীর সব দেখাইয়া খগেন হারাণকে নীচের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। ঘরটি ছোট, মেঝেয় কার্পেট পাতা, কয়েকটি গদিমোড়া চেয়ার ইতস্তত: সাজানো, মাঝখানে একটি ছোট টিপাইয়ের উপর বিলাতী কাচের ভাসে একগুচ্ছ গোলাপ-ফুল। সিগারের বাক্স বাহির করিয়া খগেন হারাণের সম্মুখে ধরিল, হারাণ নীরবে ঘাড় নাড়িল। খগেন বলিল,—"ও তুমি বুঝি এ সব খাও না। সিগারেট ? তাও না। O dear! তুমি একেবারে পুরোদস্তুর পিউরিটান।" বলিয়া নিজে সাবধানে একটি সিগার বাছিয়া লইয়া ধরাইল।

খগেন ইচ্ছা করিলে বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে গল্প করিতে পারিত; তাই দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল,—"খানা তৈয়ার।"

দু'জনে ডাইনিং রুমে উঠিয়া গেল। টেবিলের উপর খানা পরিবেশিত হইয়াছিল, খগেন হাসিয়া বলিল,—"তোমার বোধ হয় ছুরি কাঁটা চালানো অভ্যেস নেই, তা—হাতই চালাও। এখানে ত আর কেউ নেই।"

খগেনের একতরফা বাক্য-স্রোতের মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল; দু'জনে আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

খগেন ঈঙ্গিত করিতেই ভৃত্য একটা বোতল ও দুটি মদের গেলাস আনিয়া সম্মুখে রাখিল। বোতলের ছিপি খোলা হইতেছে দেখিয়া হারাণ ভীতভাবে বলিল,—"ও কি ?"

খগেন হাসিয়া উত্তর করিল,—"ভারমুথ। নাও—খাও" বলিয়া একটা গেলাস আগাইয়া দিল।

হারাণ সভয়ে হাত নাড়িয়া বলিল,—"আমি মদ খাই না।"

খগেন বলিল,—"আরে, খাও একটু for old times sake! quor নয়, সরবৎ, নেশা হবে না।"

"না না, আমি ও-সব খাব না।"

খগেন মুখ বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল,—"তুমি চিরকালই একটা—ইয়ে রয়ে গেলে। ভদ্রসমাজে মিশছো—এ সব খেতে শেখো। আচ্ছা, এমনি না খাও, তোমার —কি বলে—মিণ্টুর health drink কর। Here is to the sweetest loveliest"—বলিতে বলিতে গেলাস উর্দ্ধে তুলিল।

হারাণ ধড়মড় করিয়া চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অর্দ্ধ রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমি চল্লুম—"

"আরে বোসো। আচ্ছা, না হয় খেও না। আমি একাই খাচ্ছি।"

গেলাস নিঃশেষ করিয়া একটা টার্কিশ সিগারেট ধরাইয়া খগেন বলিল, —"বোসোই না ছাই—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলে যে। তোমার সঙ্গে দুটো কাজের কথা আছে।"

হারাণ দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল,—"কি কথা বল, আমি শুনছি।"

খগেন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কথাটা বলিতে তাহার দারুণ অপমান বোধ হইতেছিল। শেষে সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে গলার স্বরটা খুব হাল্কা করিয়া বলিল,—"তোমার বন্ধু হেমেন্দ্র বাবু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও না। কলকাতায় আছি, অথচ নিজের ক্লাশের লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল না। বুঝতেই ত পারছ—সময় কাটাবার অসুবিধা হয়—"

অস্বাভাবিক তীব্র কণ্ঠে হারাণ বলিয়া উঠিল,—"ও সব হবে না। আমি পারব না।"

একটা ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া খগেন বলিল,—"পারবে না? কেন?"

কোণ-ঠাসা বিড়াল যেমন নখ বাহির করিয়া ফোঁস করিয়া ওঠে, হারাণ তেমনই ভাবে বলিয়া উঠিল,—"তুমি একটা লম্পট, জঘন্য চরিত্রের লোক—তোমার মতলব কি আমি বুঝিনি? তোমার মতন লোককে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার চেয়ে—" কথার অভাবে হারাণ চুপ করিল।

খগেনের মুখের উপর দিয়া একটা কুটিল বিদ্রূপের ছায়া খেলিয়া গেল, কিন্তু গলার আওয়াজ চড়িল না। অনুচ্চ গরল-ভরা স্বরে হাসিয়া সে বলিল,—"You fool! You abysmal fool! তুই ভেবেছিস তোর গলায় মিণ্টু মালা দেবে—না? আমি গিয়ে তোর মুখের গ্রাস কেড়ে নেব—এই তোর ভয়! তোর মতন গাধা দুনিয়ায় নেই। তোকে তারা কি চোখে দেখে জানিস? একটা ঘোড়ার সহিসকে তারা তোর চেয়ে বেশী খাতির করে। তোকে নিয়ে তারা সঙ্ সাজিয়ে বাঁদর-নাচ নাচায়, তা বোঝবারও তোর ক্ষমতা নেই। অসভ্য uncultured চাষা কোথাকার।"

হারাণ আর সেখানে দাঁড়াইল না—একবার তাহার ইচ্ছা হইল খগেনের মুখখানা দেওয়ালে ঠুকিয়া থেঁতো করিয়া দেয়; কিন্তু তাহা না করিয়া সে কশাহত

ঘোড়ার মত ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। খগেনের শ্লেষবিষাক্ত হাসি ফুট-পাথ পর্য্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিল।

বাসায় ফিরিয়া হারাণ অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। খগেনের সঙ্গে মাখামাখির পালা যে এমন ভাবে শেষ হইবে ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। বস্তুতঃ অনীপ্সিত সহৃদয়তার জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় তাহার জানা ছিল না, তাই খগেনের এই জোর-করা বন্ধুত্ব তাহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়া তুলিলেও পরিত্রাণ পাইবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই অযাচিত বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া সে খুসী হইয়া উঠিল খগেনের মত লোকের বাড়ীতে বসিয়া তাহার মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়া দিবার ক্ষমতা যে তাহার আছে ইহাতে তাহার আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু তবু খগেনের বিষ-তিক্ত কথাগুলিও তাহার কাণে লাগিয়া রহিল— You abysmal fool! তোকে নিয়ে তারা সঙ্ সাজিয়ে বাঁদর নাচায়— অসভ্য uncultured চাষা—

ইতিমধ্যে সে যথারীতি হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ী যাতায়াত করিতেছিল; অনেকটা অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর যেদিন সে হেমেন্দ্র বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল সে দিন তাহার সেই প্রথম দিনের সঙ্কুচিত জড়তা ফিরিয়া আসিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল,—'সত্যিই কি ওরা আমাকে—"

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল—কাহারও ব্যবহারে অবজ্ঞা বা অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইল না; মিণ্টু স্বাভাবিক সরস হাসিমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; এমন কি মিণ্টুর মা তাহার সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। হারাণ তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

এইভাবে আরও দুই হপ্তা কাটিয়া গেল। তার পর এক দিন আত্মবিস্মৃত আলোর-নেশায়-মাতাল হারাণ যেন ল্যাম্পপোষ্টে মাথা ঠুকিয়া পরিপূর্ণ চেতনা ফিরিয়া পাইল।

সে দিনটা শনিবার ছিল। কলেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া হারাণ একটু বিশেষ সাজগোজ করিয়া লইল। পাঁচ সিকা দিয়া একজোড়া রবার-সোল্ টেনিস্‌সু কিনিয়াছিল, তাহাই পরিয়া পাঞ্জাবীর বাহার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পূজার ছুটীর আর দেরী নাই, শীঘ্রই বাড়ী যাইতে হইবে, অতএব——

হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিল, তখনও চারটে বাজে নাই। ড্রয়িং রুমের নিকটবর্ত্তী হইতেই, অনেকগুলি যুবতী-কণ্ঠের হাসির ঢেউ তাহার

কাণে আসিয়া লাগিল। ভিতরে বহু সখী মিলিয়া একটা ভারি কৌতুককর আলোচনা চলিতেছে—সঙ্কোচে হারাণের পা আপনিই থামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হাসি মিলাইয়া গেলে একটি কণ্ঠস্বর শুনা গেল,…"তুই এত নকল করতেও পারিস। এমন অদ্ভুত জীবটি কোত্থেকে জোগাড় করলি ভাই?"

আর একটি কণ্ঠস্বর,—"আমাদের এক দিন দেখা না, মিণ্টু!"

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হারাণ চমকিয়া উঠিল, —"আজকেই আপনারা—অ্যাঁ—তাঁর দেখা পাবেন, তিনি এই এলেন ব'লে। আজ শনিবার ত—ঠিক পাঁচটার সময় উদয় হবেন। তার নাম—হ্যাঁ—কি বলে—হারাণচন্দ্র—"

কি আশ্চর্য্য! তাহার জড়তাপূর্ণ দ্বিধা-বিম্রিত কথা বলিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত অবিকল নকল হইয়াছে।

আবার এক-পশলা সুমিষ্ট হাসির বৃষ্টি হইয়া গেল। হারাণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

"মিণ্টু, কোত্থেকে এমন চীজ আবিষ্কার করলি, বল্।"

মিণ্টুর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"আবিষ্কার করিনি, ভাই, আপনি এসে জুটেছে। দোষের মধ্যে একদিন ওকে মোটর চাপা দিয়েছিলুম—সেই থেকে আস্‌তে সুরু করেছে। কিছু বলাও যায় না।"

এক জন টিপ্পনী কাটিয়া বলিল,—"বুকের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিলি বুঝি?"

আর একজন সরু গলায় বলিল,—"তুই encourage করিস কেন? একদিন একটু শক্ত হলেই আর আসে না। ও-সব uncultured লোকগুলোকে আমল দেওয়াই উচিত নয়।"

মিণ্টু বলিল,—"সে ভাই আমি পারি না। আর, লোকটি এমন helpless কাঠের পুতুলের মত ব'সে থাকে যে কিছু বলতে মায়া হয়।"

এক জন হাসি-হাসি গলায় বলিল,—"ও নিশ্চয় তোর লভে পড়েছে। মন্দ হয় নি—beauty and the beast."

আর একটি পরিহাস চপল কণ্ঠ বলিল,—"দেখিস মিণ্টু, তুই যেন উল্টে ওর প্রেমে প'ড়ে যাসনি। তা হ'লেই বিপদ!"

হাসির উচ্ছ্বাস থামিলে মিণ্টু বলিল;—"এবার চুপ কর ভাই, হয় ত এক্ষুনি—"

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত হারাণ ফিরিয়া আসিল, পাছে কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে তাহার অন্তরের অপরিসীম গ্লানিকেও যেন ঢাকিয়া গেল।

ফুটপাথে নামিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া চলিল। চোখের সম্মুখে একটা রক্তাভ কুজ্ঝটিকা তাল পাকাইতেছিল,—তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাই ঘোলাটে বোধ হইতেছিল। কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না,—তাহার বুকের মধ্যে যে কালকূট ফেনাইয়া উঠিতেছিল তাহাই কাহারও উপর উদ্‌গিরণ করিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মা সাপের মত ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল।

সে কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহারও ঠিকানা ছিল না, কতক্ষণ এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও খেয়াল ছিল না। স্থান-কালের ধারণা তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া তাহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ আরক্ত নেত্রে তাহার দিকে ফিরতেই দেখিল—খগেন।

কিছুক্ষণ দুজনে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর হারাণ হাসিয়া উঠিল—বিকৃত কণ্ঠের বিষ-জর্জ্জরিত হাসি। খগেনের সুবেশ মূর্ত্তিটা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"খগেন বাবু! কোন্ দিকে চলেছেন?"

খগেন উত্তর দিল না, ভ্রূ তুলিয়া চাহিল। হারাণ তখন তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে না? করবে আলাপ? ঠিক রাজযোটক হবে। এস।" বলিয়া খগেনের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহার একটা বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

হেমেন্দ্র বাবুর ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া হারাণ দেখিল, সম্মুখেই সখী-পরিবৃতা মিণ্টু। কোনও দিকে না তাকাইয়া সে মিণ্টুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, খগেনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"ইনি আমার বন্ধু বাবু খগেন্দ্র নাথ—খুব বড় মানুষের ছেলে, অতিশয় পরিমার্জ্জিত, এঁর সঙ্গে আলাপ করুন। —খগেন, ইনি মিণ্টু দেবী। Good luck!—আচ্ছা, চললুম।" বলিয়া যেন একটা দুর্দ্দমনীয় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাহিনীটা এইখানেই শেষ করিতে পারিলে ভাল হইত,—পাঠক দীর্ঘ গল্প-পাঠের শ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতেন, এই হতভাগ্য লেখকও অপ্রিয় সত্যভাষণের প্রয়োজন হইতে নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু শেষ করিতে চাহিলেই কথা শেষ হয় না, নিজের গতির বেগে নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া চলে, ব্রেক কষিতে কষিতে ধাবমান ট্রেণ ভাঙ্গা পুলের মাঝখানে আসিয়া পড়ে।

যা হোক আর বাজে কথা নয়; দ্রুতবেগে কাহিনীটা শেষ করিয়া ফেলি।

তিন মাস কাটিয়া গেল। হারাণ শামুকের মত দু'দিনের জন্য মুণ্ড বাহির করিয়াছিল, আবার খোলের মধ্যে মুণ্ড ঢুকাইয়া লইয়াছে। তাহার মুখখানা আরও কৃশ ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; সে-মুখ ভাবপ্রকাশের উপযোগী

কোনকালেই ছিল না, তাই ক্ষণিক আলোক-অভিসারের কোনও চিহ্নই সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সে দিন, অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে বেশ শীত পড়িয়াছিল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে হারাণ গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া কলেজ-স্কোয়ারের সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল। একখানা খোলা মোটর ঠিক তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; মোটরখানা এত নিকট দিয়া গেল যে হারাণ ইচ্ছা করিলে তাহাতে উপবিষ্টা যুবতীকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে পারিত।

কিন্তু যুবতী তাহাকে দেখিতে পাইল না—তাহার চক্ষু সম্মুখের শূন্যের পানে তাকাইয়া ছিল। চক্ষু যখন দৃশ্য বস্তুকে দেখে না অথচ উন্মীলিত হইয়া থাকে—এ সেই দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণ দুটি একটু চাপা—যেন নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। একটু শুষ্ক ক্লান্ত ভাব—অনবদ্য সুন্দর মুখের ডৌলটি যেন ঈষৎ শীর্ণ। হারাণ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লইতে মোটরও মৃদুমন্দ গতিতে বাহির হইয়া গেল।

কলেজ-স্কোয়ারে পঁচিশবার দ্রুতপদে চক্র দিয়া হারাণ বাহির হইল। পকেটে কয়েকটা পয়সা ছিল, সে ভবানীপুরের বাসে চাপিয়া বসিল।

খগেন বাড়ীতেই ছিল, হারাণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে দীর্ঘ শিস্ দিয়া বলিয়া উঠিল, —"Hullo! হারাণ যে!"

হারাণ ঘরে গিয়া বসিল, কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জ্বলন্ত চক্ষু তুলিয়া বলিল,—"তুমি মিণ্টুকে এ কি করেছ?"

খগেন ভ্রূর একটি বিদ্রূপপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"কি করেছি?"

"তুমি—তুমি তাকে—" হারাণ কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কি বলিবে? কেমন করিয়া উচ্চারণ করিবে?

খগেন একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল,—"যদি কিছু বলতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল। আমার সময় নেই, এখনই একটা পার্টিতে যেতে হবে"

হারাণ সহসা ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল,—"খগেন, একটি বালিকার জীবন নষ্ট ক'রে দিলে?"

খগেন বলিল, ""My dear fellow, don't be melodramatic. Please, I can't stand it! অবশ্য মিণ্টুর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, যত দূর ভাব হ'তে পারে হয়েছিল। সে জন্যে তোমাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু সে সব এখন শেষ হয়ে গেছে; মিণ্টুর সঙ্গে এখন আর আমার কোনও সম্বন্ধই নেই। Socialএ পার্টিতে মাঝে মাঝে দেখা হয়, কিন্তু আমরা যতদূর সম্ভব পরস্পরকে এড়িয়ে চলি। That affair is closed". বলিয়া মুখের একটা অরুচি-সূচক ভঙ্গিমা করিল।

হারাণ বলিল,—"খগেন, তুমি মিণ্টুকে বিয়ে করলে না কেন?"

খগেন যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল,—"এক সময় মনে হয়েছিল বুঝি বিয়েই করতে হবে। কিন্তু—" খগেন হাসিতে লাগিল,—"মিণ্টু বাইরে খুব স্মার্ট গার্ল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু বোকা আছে। নিজেই এসে ধরা দিল—"

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিয়া খগেন আবার বলিল,—"জানো, মিণ্টু আমার এই বাসায় কতবার এসেছে? ত্রিশ বারের কম নয়। প্রথম দু' একবার তার মা সঙ্গে ছিল, তার পর একলা। **Well, you know after that**—"

"কিন্তু তুমি তাকে বিয়ে করলেই ত পারতে, খগেন।"

"কথাটা নেহাৎ আহাম্মকের মত বললে। বিয়ের আগেই যে মেয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, তাকে বিয়ে করব কি জন্যে? শেষ পর্যন্ত আমাকেই বলতে হ'ল,—'মিণ্টু, নেশা ছুটে গেছে, এবার বিদায় দাও।"

"কিন্তু কেন? কেন?"

"তা জানি না। প্রকৃতির এই নিয়ম বোধ হয়। রবিবাবুর পুরুষের উক্তি পড়েছ ত—'ক্রমে আসে আনন্দ আলস।' কিন্তু তোমাকে এত কথা কেন বলছি জানি না; তুমি মিণ্টুর গার্জ্জেনও নও, ভাবী স্বামীও নও।" হাসিয়া খগেন উঠিয়া দাঁড়াইল—"আমায় এখনি বেরুতে হবে।"

"খগেন, তুমি একটা পশু—একটা জানোয়ার।"

খগেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। "তোমার সঙ্গে কথাকাটাকাটি করতে আমার ভাল লাগে না। আমি যা হাতের কাছে পেয়েছি—নিয়েছি; সেজন্য কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমি না নিলে আর কেউ নিত। যাও—বেরোও এখন।" বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হারাণ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় তখন গ্যাস জ্বলিয়াছে, শীতের আকাশে নক্ষত্র মিটমিট করিতেছে। হারাণের বুক পিষিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল—"আমার দোষ! আমার দোষ! কেন আমি এমন পাগলের মতন কাজ করলুম!"

দেয়ালীর সময় অসংখ্য পোকা পুড়িয়া মরিতে দেখিয়া মনে হয় বুঝি পোকার বংশ নিঃশেষ হইয়া গেল, পৃথিবীতে আর পোকা নাই। পরের বৎসর আবার অসংখ্য পোকার আবির্ভাব হয়—যুগে যুগে এই চলিতেছে। আলো যতদিন আছে ততদিন পতঙ্গ পুরিয়া মরিবে। দোষ কাহার?

১৩ আশ্বিন, ১৩৪০

ভাল বাসা

যুদ্ধের হিড়িকে বোম্বাই সহরে বাঙালী অনেক বাড়িয়াছে। আগে যত ছিল তাহার প্রায় চতুর্গুণ। তিন বছর আগেও বোম্বাইয়ের পথেঘাটে গুজরাতি-মারাঠি-পার্সী-গোয়ানিজ মিশ্রিত জনারণ্যে হঠাৎ একটি সিঁদুর-পরা বাঙালী মেয়ে বা ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা পুরুষ দেখিলে মন পুলকিত হইয়া উঠিত, যাচিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখন পদে পদে হাফ্ প্যাণ্ট পরা দ্রুতপদচারী বাঙালী যুবকের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যায়। যাঁহারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সহরের উত্তরাঞ্চলে খানিকটা স্থানে বাঙালী-পাড়া তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন; নূতন আমদানী যাহারা, তাহারা সহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোথায় কি ভাবে থাকে তাহার ঠিকানা করা কঠিন। তাহারা যুদ্ধের জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়াছে, যখন যুদ্ধ শেষ হইবে তখন আবার ভাঁটার টানে বাংলা দেশের বিপুল গর্ভে ফিরিয়া যাইবে।

গত সাত বৎসর যাবৎ আমি ও এ-প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছি। তবে আমি বোম্বাই সহরের সীমানার বাহিরে থাকি; বেশী দূর নয়, মাত্র আঠারো মাইল। বাড়ীটি ভাল এবং পাড়াটি নিরিবিলি; ইলেকট্রিক ট্রেণের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যে সহরে পৌঁছানো যায়, কোনও হাঙ্গামা নাই। সহরে থাকার সুখ ও পাড়াগাঁয়ে থাকার শান্তি দুই-ই একসঙ্গে ভোগ করি। বন্ধুরা হিংসা করেন—কিন্তু সে যাক। এটা আমার কাহিনী নয়, ঘেঁচুর উপাখ্যান।

মাসকয়েক আগে একটা কাজে সহরে গিয়াছিলাম। গিরগাঁও অঞ্চলের জনাকীর্ণ ফুটপাথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি—ঘেঁচু! বিকালবেলার পড়ন্ত রৌদ্রে খাকি হাফ্প্যাণ্ট ও হাফ্সার্ট-পরা কৃষ্ণকায় ছোকরাকে দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না—আমাদের ঘেঁচুই বটে। তাহার চেহারাখানা এমন কিছু অসামান্য নয় কিন্তু অমন সজারুর মত খোঁচা খোঁচা চুল এবং তিনকোণা কান আর কাহারও হইতেই পারে না।

ঘেঁচুকে ছেলেবেলা হইতেই চিনি ; আমাদের গায়ের ছেলে—বিষ্ণু মাইতির ভাইপো। এখন বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি দাঁড়াইয়াছে। যখন তাহাকে শেষ দেখি তখন সে গাঁয়ের মিড্ল স্কুলে পড়িত এবং ডাংগুলি খেলিত। চেহারা কিছুই বদলায় নাই, কেবল একটু ঢ্যাঙা হইয়াছে। এই ছেলেটা বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের একটি পঙ্কিল পানাপুকুরের অতিক্ষুদ্র পুটিমাছের মত ছিপের এক টানে একেবারে বোম্বাইয়ের শুক্না ডাঙায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম—'আরে ঘেঁচু! তুই?'

ঘেঁচু একটা ইরাণী হোটেল হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইতেছিল, আমার ডাক শুনিয়া ক্ষণকাল বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া রহিল; তারপর লাফাইয়া আসিয়া এক খামচা পায়ের ধূলা লইল—

'বটুকদা!'

তাহার আনন্দবিহ্বলতার বর্ণনা করা কঠিন। হারানো কুকুরছানা অচেনা পথের মাঝখানে হঠাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইলে যেমন অসম্বৃত আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠে, ঘেঁচুও তেমনি আমাকে পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল—কি বলিবে কি করিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পায় না। সে সামান্য একটু তোৎলা, কিন্তু এখন তাহার কথা পদে পদে আটকাইয়া যাইতে লাগিল—'হাঃ আশ্চর্য্য! আপনি কী করে আমাকে দেখে ফেললেন? আম্মিও আপনার ঠিকানা লিখে এনেছিলুম, ক্‌কিন্তু কাগজের চিলতেটা কোথায় হাঃ হারিয়ে গেল। আর ক্কী করে খোঁজ নেব? কেউ একটা কথা বুঝতে পারে না, কিড়ির মিড়ির ক'রে ক্কী বলে আম্মিও বুঝতে পারি না—এসে অবধি একটা বাঙালীর মুখ দেখি নি। ভাঃ ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল—নৈলে তো—'

নিজের কাজ ভুলিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়াই তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলাম। ছেলেটা ভালমানুষ, তাহার উপর বলিতে গেলে এই প্রথম পাড়াগাঁয়ের বাহিরে পা বাড়াইয়াছে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। দিন সাতেক হইল সে বোম্বাই আসিয়াছে, আসিয়াই কোন্ এক যুদ্ধ সম্পর্কিত কারখানায় যোগ দিয়াছে। একটা মাথা গুঁজিবার আস্তানা খুঁজিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল, শেষে এক মারাঠি সহ-কর্ম্মীর কৃপায় একটা চৌলে একটি খোলি পাইয়াছে। সেইখানেই থাকে এবং চৌলের নীচের তলায় একটা নিরামিষ হোটেলে খায়। এখানে আসিয়া অবধি মাছের মুখ দেখে নাই, কেবল ডাল রুটি আর তেলাকুচার তরকারি খাইয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া ঘেঁচু সজলনেত্রে বলিল—'ব্বটুকদা, এদেশের রান্না আমি ম্মুখে দিতে পারি না; খাবারের দিকে যখন তাকাই প্রাণটা হু হুঃ ক'রে উঠে। আর কিছু নয়, দুটি ভাত আর ম্মাছের ঝোল যদি পেতুম—'

বলিলাম—'সে না হয় ক্রমে সয়ে যাবে। কিন্তু তুই যে এখানে একটা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছিস্ এই ভাগ্যি। আজকাল তাই কেউ পায় না।'

ঘেঁচু বলিল—'ম্মাথা গোঁজবার জায়গা যদি স্বচক্ষে দেখেন বটুকদা তা হলে আপনারও ক্কান্না পাবে। আসবেন—দেখবেন? বেশী দূর নয়, ঐ মোড়টা ঘুরেই—'

ঘেঁচুর সঙ্গে তাহার বাসা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড একখানা চারতলা

বাড়ী, তাহার আপাদমস্তক পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কুঠরী বা খোলি। প্রত্যেক কুঠুরীতে একটি করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবার থাকে; সেই একটি ঘরের মধ্যে শয়ন রান্না সব কিছুই সম্পাদিত হয়। ইহাই বোম্বাইয়ের চৌল। এক একটি বড় চৌলে শতাধিক ভদ্র দরিদ্র পরিবার কাচ্ছাবাচ্ছা লইয়া বৎসরের পর বৎসর বাস করে। ঐটুকু পরিসরের অধিক বাসস্থান পাওয়া যায় না, বোধ করি প্রয়োজনও মনে করে না।

ঘেঁচুর খোলি চৌলের চারতলায়। তিনপ্রস্থ অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। লম্বা সঙ্কীর্ণ বারান্দা এপ্রান্ত ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই দুই পাশে সারি সারি ঘরের দরজা। বারান্দায় অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, কুস্তি লড়িতেছে। প্রত্যেকটি দ্বারের কাছে একটি দুটি স্ত্রীলোক মেঝেয় বসিয়া গম বা ডাল বাছিতেছে, নিজেদের মধ্যে হাসিতেছে গল্প করিতেছে। অপরিচিত আগন্তুক কেহ আসিলে ক্ষণেক নিরুৎসুক চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া আবার ডাল বাছায় মন দিতেছে।

বারান্দার একপ্রান্তে ঘেঁচুর ঘর। দেখিলাম, ঘরটি আদৌ ঘর ছিল না, ব্যালকনি ছিল। ঘরের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান গৃহস্বামী স্থানটি তক্তা দিয়া ঘিরিয়া সম্মুখে একটি দরজা বসাইয়া রীতিমত ঘর বানাইয়া ভাড়া দিতেছেন। ভিতরটি দেশালায়ের বাক্সের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঘেঁচুর একটি তোরঙ্গ ও গুটানো বিছানাতেই তাহার অর্দ্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে।

ঘেঁচু বলিল—'দেখছেন তো। দরজা বন্ধ করলে দম বন্ধ হয়ে যায়, আর খুলে রাখলে মনে হয় হাঃ হাটের মধ্যিখানে বসে আছি। সাতদিন রয়েছি, একটা লোকের সঙ্গে মুখ-চেনাচেনি হয় নি। কেউ ডেকে কথা কয় না; আর কী বা কথা কইবে? বুঝতে পারলে তো! ইংরিজিও কেউ বোঝে না, সব সাট্টাবাজারের গোমস্তা। বলুন তো, এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে? কেন যে মরতে চাকরি করতে এসেছিলুম! এক এক সময় লোভ হয়, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার কি জো আছে—লড়াইয়ের চাকরি—ধরেই জেলে পুরে দেবে—'

ছেলেটার কথা শুনিয়া বড় মায়া হইল; বলিলাম—'চল ঘেঁচু, তুই আমার বাড়ীতে থাকবি। আমার একটা ফালতু ঘর আছে—হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবি। আর কিছু না হোক, তোর বৌদির রান্না ডালভাত তো দু'বেলা পেটে পড়বে।'

আহ্লাদে ঘেঁচু নাচিয়া উঠিলেও, শেষ পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা গেল ব্যবস্থাটা খুব কার্য্যকরী নয়। ঘেঁচুকে সকাল আটটার মধ্যে কারখানায় হাজ্‌রি দিতে হয়। একঘণ্টা ট্রেণে আসিয়া তারপর আরও আধঘণ্টা পায়ে

হাঁটিয়া ঠিক আটটার সময় প্রত্যহ কারখানায় হাজির হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর মনে হইল না।

ঘেঁচু দুঃখিত ভাবে বলিল—'আমার কপালে নেই তো কী হবে। কিন্তু বটুকদা, এখানে আর পারছি না। আপনি অন্য কোথাও একটা ভূভাল বাসা দেখে দিন—যেখানে সকাল বিকেল দুটো বাংলা কথা শুনতে পাই—আর যদি মাঝে মাঝে দুটি মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যায়—'

আমি বলিলাম—'চেষ্টা করব। কিন্তু আজকাল ভাল বাসা পাওয়া তো সহজ কথা নয়। যদি বা একটা ভদ্রলোকের মত ঘর পাওয়া যায় তার ভাড়া হয় তো পনেরো টাকা কিন্তু পাগ্‌ড়ী দিতে হবে দেড় হাজার।'

ঘেঁচু চক্ষু কপালে তুলিল বলিল—'পাগড়ী ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাগ্‌ড়ী; যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া। সেলামী আর কি! গভর্ণমেণ্ট্ আইন করে দিয়েছে বাড়ীওয়ালা ভাড়া বাড়াতে পারবে না, তাই রসিদ না দিয়ে মোটা টাকা গোড়াতেই আদায় করে নেয়। এ তো আর ভেতো বাঙালী বুদ্ধি নয়—গুজ্‌রাতি বুদ্ধি।'

ঘেঁচু বলিল—'ও ব্বাবা, অত টাকা কোথায় পাব। মাইনে তো পাই কুল্লে —'

বলিলাম, 'না না, সে তোকে ভাবতে হবে না। বাসা যদি যোগাড় করতে পারি, বিনা পাগ্‌ড়ীতেই পাবি। চেষ্টা করব দাদারে, মানে বাঙালী পাড়ায়। তোর ভাগ্যে থাকে তো এক-আধটা ঘর পেলেও পেতে পারি। কিন্তু তুই ভরসা রাখিস নে; মনে ভেবে রাখ এইখানেই তোকে থাকতে হবে। আর একটা কথা বলি, যখন এদেশে এসেছিস তখন এদেশের ভাষাও শিখতে আরম্ভ কর। নৈলে এভাবে কদ্দিন চালাবি ?'

কাতরভাবে ঘেঁচু বলিল—'সে তো ঠ্‌ঠিক কথা বটুকদা, কিন্তু ও কিচির মিচির ভাষা কি শিখতে পারব ? ভাষা শুনলে মনে হয় চ্চাল কড়াই দাঁতে ফেলে চিবচ্ছে—'

বলিলাম—'নতুন নতুন অমনি মনে হয়—ক্রমে সয়ে যাবে। কথায় বলে যস্মিন দেশে যদাচারঃ।'

নিরপরাধ আসামী যেভাবে ফাঁসির আজ্ঞা গ্রহণ করে তেমনিভাবে ঘেঁচু বলিল—'ব্বেশ, আপনি যখন বলছেন—'

সেদিন ঘেঁচুকে তাহার কোটরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম, স্থির করিলাম অবকাশ পাইলেই দাদারে গিয়া তাহার জন্য ভাল বাসার খোঁজ করিব। সেখানে অনেক ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদেরই কাহারও পরিবারে একটি আলাদা ঘর ও দুটি মাছের ঝোল ভাত জোগাড় করা বোধ করি একেবারে অসম্ভব হইবে না।

তারপর পাঁচটা কাজে পড়িয়া ঘেঁচুর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে পড়িল প্রায় দু'হপ্তা পরে। বেচারা নির্ব্বান্ধব পুরীতে তেলাকুচার তরকারি

খাইয়া কত কষ্টই না পাইতেছে এবং অসহায় ভাবে আমার পথ চাহিয়া আছে। অনুতপ্ত মনে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দাদারে গেলাম। ঘেঁচুর কপাল ভাল, দু-একজনের সঙ্গে কথা কহিয়াই খবর পাইলাম, একটি ভদ্রলোকের বাসায় একটি ঘর শীঘ্রই খালি হইবার সম্ভাবনা আছে—যে বৈতনিক অতিথিটি ঘর দখল করিয়া আছেন তিনি নাকি শীঘ্রই বদ্‌লি হইয়া চলিয়া যাইবেন। দ্রুত গিয়া ভদ্রলোককে ধরিলাম। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বিফল হইল না। বৈতনিক অতিথিটির চলিয়া যাইতে এখনও হপ্তা-দুই দেরি আছে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলেই ঘেঁচু তাঁহার স্থান অধিকার করিবে, এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল।

ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম ঘেঁচুকে সুখবরটা দিয়া যাই, সে আশায় বুক বাঁধিয়া এই কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ঘেঁচুর চৌলে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাহার কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখি সে মেজেয় বিছানা পাতিয়া বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'বটুকদা, আপনি ব'লে গিছলেন, এই দেখুন মারাঠি প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। ব্বাপ্, এর নাম কি ভাষা, স্রেফ পাথর আর ইটপাটকেল। হুঃ হুচ্চারণ করতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা যখন ধরেছি, হয় এস্পার নয় ওস্পার।'

হাসিয়া বলিলাম—'বেশ বেশ! কিন্তু শিখছিস কার কাছে? শুধু বই থেকে তো শেখা যায় না।'

ঘেঁচু বলিল—'সে জোগাড় হয়েছে। ৩৭ নম্বর ঘরে থাকে—বেঙ্কটরাও ব'লে একজন মারাঠি। বেশ ভদ্রলোক, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবে একটু আধটু হিঃ হিংরিজি বলতে পারে—সেই শেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের translation পড়েছে কিনা, বাঙালীর ওপর ভারি ভক্তি।'

রবীন্দ্রনাথ, আর কিছু না হোক, বাঙালীর জন্য ঐটুকু করিয়া গিয়াছেন, বিদেশে তাঁহার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে খাতির পাওয়া যায়।

যা হোক, ঘেঁচুকে বাসার খবর দিয়া তাহার মাছের-ঝোল ভাত সম্ভোগের আসন্ন সম্ভাবনার আশ্বাস জানাইলাম। সে আহ্লাদে এতই তোৎলা হইয়া গেল যে তাহার একটা কথাও বোঝা গেল না। অতঃপর সে-রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম।

দু'হপ্তা পরে দাদারের ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে বাসা খালি হইয়াছে, এখন ঘেঁচু ইচ্ছা করিলেই তাহা দখল করিতে পারে। আবার ঘেঁচুর কাছে গেলাম। তাহাকে তাহার নূতন বাসায় অধিষ্ঠিত করিয়া তবে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব।

সন্ধ্যার পর বাতি জ্বলিয়াছিল। ঘেঁচুর ঘরের কাছে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে বেশ একটি ছোটখাটো মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাতা বিছানার উপর চা এবং এক থাল চিঁড়া চীনাবাদাম

ভাজা (এদেশের ভাষায় 'ভাজিয়া') ; তাহাই ঘিরিয়া বসিয়াছে ঘেঁচু এবং একটি মহারাষ্ট্র মিথুন। পুরুষটি বেঁটে নিরেট ধরণের চেহারা, বুদ্ধিমানের মত মুখ, নারীটি কুঙ্কুমচিহ্নিত ললাট, আঁটসাঁট আঠারো হাত শাড়ী পরা একটি স্নিগ্ধ কমকান্তি যুবতী। চা পান, 'ভাজিয়া' ভক্ষণ ও হাস্যকৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে ভাষা শিক্ষা চলিতেছে। আর, একটি হাফপ্যাণ্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিহিত দুই বছরের বালক আপন মনে ঘরময় দাপাইয়া বেড়াইতেছে।

আমাকে দেখিতে পাইয়া ঘেঁচু একটু সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বন্ধুদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

'এই যে আসুন বটুকদা। ইনি হলেন গিয়ে বেঙ্কটরাও পাটিল, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলুম। আর ইনি হচ্ছেন ওঁর স্ত্রী হংসাবাই। আর ঐ যে দেখছেন ছোট্ট মানুষটি, উনি হচ্ছেন এঁদের ছেলে।'

নবপরিচিতদের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিছানার একপাশে বসিলাম। যুবকটি একটু গম্ভীর অল্পভাষী, যুবতীটি সপ্রতিভ মৃদুহাসিনী। মারাঠি মেয়েদের মধ্যে ঘোমটা বা পর্দা কোনকালেই নাই; অনাত্মীয় পুরুষের সহিত সুষ্ঠু মেলামেশার কোনও বাধা নাই। দেখিলাম ঘেঁচু এই নবীন মারাঠিদম্পতীর বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ঘেঁচু শিশুটির গতিবিধি স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কী দুষ্টু যে ঐ ছেলেটা—যাকে বলে আস্ত ডাকাত, এক্কেবারে আসল বর্গী। ওর নাম কি জানেন? বিঠ্ঠল। যাকে আমাদের দেশে বিটলে বলে তাই।' ঘেঁচু উচ্চ-কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বলিলাম—'ঘেঁচু, তোমার নতুন বাসা খালি হয়েছে—কালকেই গিয়ে দখল নিতে পার।'

ঘেঁচু হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তোৎতলাইতে আরম্ভ করিল। তাহার তোৎলামি কতকটা শান্ত হইলে বুঝিলাম সে বলিতেছে—'আমি এইখানেই থাকি বটুকদা, এখানে মন বসে গেছে। এঁদের সঙ্গে ভ্ভাব হয়ে অবধি... জানেন, আজকাল আমি এঁদের সঙ্গেই খ্খাবার ব্যবস্থা করেছি। এঁরা রুটি ভাত দুইখান; ম্মাছ মাংস অবিশ্যি হয় না, কিন্তু ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। হংসাবৌদি যে ক্কী সুন্দর রাঁধেন তা আর কী বলব। বড্ড ভাল লোক এঁরা। আমি আর কোথাও যাব না বটুকদা, মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলুম—

শিশু বর্গীটি ইতিমধ্যে ঘেঁচুর ট্রাঙ্কের উপর উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঘেঁচু তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—'এই বিটলে এদিকে আয়—ইক্ড়ে ইক্ড়ে।'

বুঝিলাম, ঘেঁচুর ভাল বাসার আর প্রয়োজন নাই, সে ঐ বস্তুই আরও ঘনিষ্ঠ আকারে লাভ করিয়াছে।

৮ই চৈত্র ১৩৫৯

অন্ধকারে

বছর কয়েক আগে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একটা রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া কলিকাতা সহরটা দেখিতে দেখিতে দুই হাত জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি এখনো অনেকের স্মরণ আছে। অবশ্য কলিকাতার জলনিকাশের যেরূপ সুব্যবস্থা তাহাতে সহরের কোনও কোনও অংশে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হইবার পরই এক হাঁটু জল জমিয়া যাওয়া কিছু নূতন নয়। কিন্তু সেবারের দুর্য্যোগ এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ করি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এমনটা দেখা যায় নাই। ইলেকট্রিক তার ছিঁড়িয়া রাস্তায় গ্যাস বাতি নিভিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য মহানগরী একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সত্যমিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি সেই এক রাত্রের জন্য একটা মোম বাতির দাম পাঁচ পয়সা হইতে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বাদুড় বাগানে আমার বাসা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জরুরী কাজে সহরের উল্টাদিকে হাওড়ার অভিমুখে গিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিতে সাতটা বাজিয়া গেল। ফিরিবার পথে চা খাইবার জন্য দর্ম্মাহাটার কাছাকাছি একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকিলাম। বাহিরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো কাচের উপরকার বৃষ্টি বিন্দু ভেদ করিয়া ঝাপসা ভাবে বাহির হইতেছে। আমার দুর্ভাবনার বিশেষ হেতু ছিল না—সঙ্গে ছাতা ছিল। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম।

দোকানে বেশী লোকজন ছিল না। দুটি লোক—একজন আধ-বয়সী ও একজন কর্ণমূল পর্য্যন্ত জুলপি বিশিষ্ট যুবক—অয়েলক্লথ মোড়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দানীবাবু এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করিবার আপেক্ষিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে উত্তপ্তভাবে আলোচনা করিতেছিল। চা খাওয়া অনেকক্ষণ তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তর্কের ভালরকম নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্যই বোধ করি, তাহারা উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক বলিল; 'জানেন মশায়, শিশির ভাদুড়ী আগাগোড়া বুড়ো আলমগীরের পার্ট করে একবারও দাঁত বেরোয় না।'

আধবয়সী লোকটি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, 'ভারী কেরামতি! দাঁত নেই ত বেরুবে কোথেকে? আর দাঁত না বেরুলেই বড় অ্যাক্টর হয় নাকি?'

যুবক চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'আপনিও ত বুড়ো হয়েছেন, দাঁত না বার করে একটা কথা বলুন না দেখি!'

তর্ক শুনিতে শুনিতে ও চা খাইতে খাইতে প্রায় মিনিট পনের কাটিয়া গেল। চা শেষ করিয়া দাম দিয়া দোকান হইতে বাহির হইতেছি—যুবক তখন দানীবাবু সম্বন্ধে অত্যন্ত মানহানিকর কথাবার্ত্তা বলিতেছে—এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা উন্মত্ত হাওয়া কোথা হইতে আসিয়া দরজা জানালাগুলাকে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই নীল রঙের ভয়ঙ্কর আলোতে দু'চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় শব্দে বাজ পড়িয়া কানদুটাকে যেন বধির করিয়া দিল। তাহারি মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম, আকাশের গায়ে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। দিগন্ত ব্যাপিয়া নিকষকালো মেঘের উপর আরও কালো মেঘ জমিয়া যেন নিরেট নিভাঁজ হইয়া গিয়াছে—অন্য জিনিষের একতিল সেখানে যায়গা নাই।

এইবার ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড় বড় ফোঁটা তির্য্যক্‌ভাবে নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে পড়িতে সুরু করিল। রাস্তার আলোগুলা জলের পুরু পর্দ্দার অন্তরালে পড়িয়া নিস্তেজ হইয়া গেল, শুধু তাহাদের চারিদিক হইতে একটা মণ্ডলাকার প্রভা বাহির হইতে লাগিল।

দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম; চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলাম; 'আর এক পেয়ালা চা দাও ত হে।'

মেঘের আকস্মিক ধমকে তার্কিক দুজনের বিসম্বাদ সহসা থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আবার আরম্ভ করিল, 'দানী ঘোষ যদি ইচ্ছে করে, অমন পাঁচটা শিশির ভাদুড়ীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে!'

জুলপি বিশিষ্ট ছোকরা কড়া রকম একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক না মশায়। পৃথিবীতে দানী ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ী ছাড়া আর কি লোক নেই? অন্য কিছু আলোচনা করুন না।'

জুলপি সিংহবিক্রমে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চা খাচ্ছেন চা খান। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবেন না।'

আমি চা খাইতে লাগিলাম।

ক্রমে আটটা বাজিল। বৃষ্টির বিরাম নাই—সমভাবে সতেজে চলিয়াছে। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসিল।

নয়টা বাজিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ভিতরে তর্ক একভাবে চলিয়াছে। অদ্ভুত একনিষ্ঠা এই দুটি লোকের, তখনো দানী ঘোষ ও শিশির ভাদুড়ীকে লইয়া কামড়া কামড়ি করিতেছে। পৃথিবীতে যেন অন্য প্রসঙ্গ নাই।

সাড়ে নয়টায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।' যে করিয়া হোক রাত্রে বাড়ী পৌঁছিতেই হইবে। কিন্তু যাই কি করিয়া? ছাতায় এ বৃষ্টি আট্‌কাইবে না—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইব।

একে আমার সর্দ্দির ধাত—তখন নিউমোনিয়া ঠেকাইবে কে ? এই সময় বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল ; হঠাৎ হাওয়ার বেগ যেন বাড়িয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে উকিঝুঁকি মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

দোকানের চাকরটা নিস্পন্দভাবে নিবন্ত উনানের পাশে উপু হইয়া দেয়াল-ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর ধূঁয়ায় মলিন ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা পীতবর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। বাহিরে আশেপাশের দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—মোটরের হর্ণ ও ট্রামের ঢং ঢং আর শুনা যাইতেছে না।

যুবক বলিল;—শিশির ভাদুড়ী—

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

দোকানের চাকর ভাঙা গলায় বলিল ;—তার ছিঁড়ে গেছে—আজ রাতে আর মেরামত হবে না। দেশালাই দেবেন বাবু—ল্যাম্পোটা জ্বালি।'

অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেশালাই দিলাম। ল্যাম্পো জ্বলিল। মিটমিটে আলো ও দুর্গন্ধ ধূঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণে প্রথম অন্য কথা কহিলেন, বলিলেন;—নীলমণি, কেটলীটা আর একবার চড়াও—আর এক পেয়ালা চা হোক।

জুলপিধারী যুবক তীব্রভাবে আমার দিকে একবার তাকাইয়া গর্ব্বিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল; 'সিগারেট আছে ?'

আমি পকেট হইতে সিগারেট কেসটা বাহির করিয়া দিলাম। গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া যুবক কেসটা তাচ্ছিল্যভরে আমায় ফেলিয়া দিল। তারপর এমনভাবে আমার দিকে পিছু করিয়া বসিল, যেন আমার বাঁচিয়া থাকার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আর আমি কাহারও কোনও কাজেই লাগিব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, —'এ বৃষ্টিতে বেরুনো যাবে না। গ্যাসগুলোও নিভে গেছে দেখচি। যা বাবা!' বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে আবার সেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

আমিও বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম,—সত্যই ত। রাস্তার গ্যাসবাতী একটাও জ্বলিতেছে না। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনমানব নাই। কেবল অবিশ্রান্ত বারি পতনের ঝুপঝুপ ঝম্ ঝম্ শব্দ।

আর এক পেয়ালা চা খাইলাম। প্রৌঢ়লোকটি বলিলেন,—"আজ রাত্রে বাড়ী যাওয়া হল না দেখছি। নীলমণি, বিষ্টি থামলে আমাকে তুলে দিও।" বলিয়া বেঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। যুবক কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সিগারেট টানিতে লাগিল।

কিন্তু আমার ত বেঞ্চির উপর রাত্রি কাটাইলে চলিবে না, বাড়ী যাওয়াই চাই। বাড়ীতে স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া একলা আছেন। ঝিও হয়ত বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অথচ বৃষ্টি না ধরিলে যাই বা কেমন করিয়া ?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি—এগারোটা !

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাকের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটা অনৈসর্গিক শব্দ বাহির হইতেছে। যুবক স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাঁহার ঘুম ভাঙিলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

রাত্রি যত গভীর হইতেছে, আমার মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। এদিকে ঝড়বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে কিছুমাত্র শ্রান্তির লক্ষণ নাই।

ঘড়ির কাঁটা সরিয়া সরিয়া পৌনে বারোটায় পৌঁছিল। নীলমণির ল্যাম্পোর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বাতিটা একবার নাড়িয়া বলিল;—'তেল ফুরিয়ে গেছে—আর পাঁচ মিনিট'।

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাসিকা-নিঃসৃত একটি ধ্বনি অর্দ্ধপথে রুখিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন;—'অ্যাঁ, থেমেছে ?'

নীলমণি বলিল,—'না বাবু, আলো নিভে যাচ্ছে।'

'ওঃ' বলিয়া নিরুদ্বেগ প্রৌঢ় আবার শুইবার উপক্রম করিলেন।

শিকার ফস্কায় দেখিয়া যুবক বলিল;—'আমি তখন বলছিলুম শিশি—'

আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম,—'খবরদার বলছি ! ফের যদি ওদের নাম করেছ ছোকরা, তোমার জুলপি ছিঁড়ে নেব।'

আমার এই আকস্মিক উগ্রতায় যুবক ও প্রৌঢ় দুজনেই স্তম্ভিতবৎ আমার মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি ভগ্নস্বরে কহিল,—'বিষ্টি ধরে আসছে বাবু, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। আমি দোকান বন্ধ করি।'

সাগ্রহে বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখি সত্যই বৃষ্টির বেগ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে—ঝড়ও যেন থামিয়াছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া বুঝি তাহারা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ছাতাটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর দেরী নয়। যাইতে হয় ত এই সময়।

পশ্চাৎ হইতে যুবকের কণ্ঠস্বর আসিল;—'মশায়, দেশালাইয়ের গোটা-কয়েক কাঠি দেবেন কি ?'

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এই সময় পিছু ডাক ! পকেট হইতে দেশলাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ল্যাম্প দপ দপ করিয়া দু'বার খাবি খাইয়া নিভিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

কি অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড সহর বর্ষার রাত্রিকালে সহসা আলোকহীন হইয়া গেলে যে কিরূপ ভয়ানক অন্ধকার হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। খুব শক্ত করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে কিম্বা অন্ধ করিয়া দিলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশী অন্ধকার হয় না। নিস্পলক চক্ষুদুটা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বিস্ফারিত হইয়া থাকে—এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হইয়া উঠে।

প্রথম ঝোঁকে খুব খানিকটা চলিয়া আসিয়া থমকিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইতেছি—কোনদিকে যাইতেছি? বাড়ী গিয়া পৌঁছিবার একান্ত আগ্রহে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এই বিদ্ঘুটে অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইব কি প্রকারে? দোকান হইতে বাহির হইয়া ঠিক যে কোন মুখে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হয়ত বা যেদিকে বাড়ী তাহার উল্টা পথেই গিয়াছি। এখন উপায়!

কিন্তু পথের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যে দিকে হোক চলা দরকার, যদি এমনিভাবে চলিতে চলিতে কোথাও একটা আলো বা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং আবার সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বৃষ্টি ও ঝড় ক্রমে কমিয়া কমিয়া একটা বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থামিয়া গেল। তখন এই অন্ধকারের বুকের উপর আর একটা জিনিস চাপিয়া বসিল—সেটা এই মধ্যরাত্রির ভয়াবহ নীরবতা। এতক্ষণ বৃষ্টির ঝপ্ ঝপ্ শব্দ ও বাতাসের গোঙানিতে যাহা চাপা ছিল, এখন তাহা উলঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। পৃথিবীর সব মানুষ যেন মরিয়া গিয়াছে শুধু আমি একা বাঁচিয়া আছি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা—একেবারে নিঃসঙ্গ।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। মনের গূঢ়তম প্রদেশে বোধকরি এই আকাঙ্ক্ষাটাই দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ চাই, সঙ্গী চাই, কোনও প্রকারে এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই প্রচণ্ড একটা হোঁচট লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে এক কোমর জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ছাতাটা হাত হইতে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম,—না, এক কোমর নয়, তবে জল এক হাঁটু বটে। আন্দাজে বুঝিলাম বোধ হয় এতক্ষণ ফুট্‌পাথে চলিতেছিলাম এবার রাস্তায় নামিয়াছি। কিন্তু এই অবতরণটি যেমন সুখকর নয়, ফুট্‌পাথে ফিরিয়া যাওয়াও তেমনি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ

ফুট্‌পাথ যে কোন দিকে তাহা জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুলাইয়া গিয়াছে।

পাঁচ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইবার পর যে রাস্তায় জল জমিতে পারে এ সম্ভাবনাটা তখন পর্য্যন্ত মাথায় আসে নাই। কিন্তু ভগবান যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন দুশ্চিন্তা হইল—না জানি কোথায় অথৈ গভীর জল আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়ত একপা অগ্রসর হইলেই হুস করিয়া ডুবিয়া যাইব।

এক হাঁটু জলের মধ্যে এক পা এক পা করিয়া সাবধানে অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় ভগবান! এ আমার কি দুর্দ্দশা করিলে। কেন মরিতে আজ ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। যদি বাহির হইয়াই ছিলাম তবে চায়ের দোকানে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম না কেন?

কিন্তু পশ্চাত্তাপে কোনও ফল হইবে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিতে চেষ্টা করিলাম—এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত্। প্রথমতঃ কোনও রকমে ফুট্‌পাথে ওঠা চাই—মাঝ রাস্তায় জলের মধ্যে দিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেও কোনও একটা লক্ষ্যে পৌঁছানো যাইবে না। ফুট্‌পাথে উঠিতে পারিলে, কোনও একটা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়া লোক জাগাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে কিম্বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব। মোট কথা যে উপায়েই হোক, নরলোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করা দরকার। এই অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বেশী নয়, আপাততঃ একটা মানুষের দেখা পাইলেও যে সাক্ষাৎ চাঁদ হাতে পাইব তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

শামুকের মত হাঁটিয়া হাঁটিয়া কিন্তু কোনও দিকেই এমন একটা বিশিষ্ট কিছু ধরিতে পারিলাম না যেখান হইতে আমার যাত্রাটাকে সুনিশ্চিত করিতে পারি। এক হাঁটু জল কখনো কমিয়া আধ হাঁটুতে নামিতেছে, কখনো উরুত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। এ ছাড়া, দিগ্‌দর্শন করিবার কিম্বা আবার যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার আর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নই নাই।

সৃষ্টির প্রথম জীব বোধকরি এমনি অন্ধভাবে প্রলয়পয়োধির অতলতলের মহা স্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্ট পরিচালিত হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইত; এবং আবার মহাপ্রলয়ের দিন যখন সূর্য্যচন্দ্রের আলো নিভিয়া যাইবে, তখন সৃষ্টির শেষ জীব এমনি নিরুপায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এই ভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না—সময়ের ধারণাও এই ঘোর নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের আঙুলে একটা শক্ত বস্তু ঠেকিল। অনুভবে সিঁড়ির ধাপের মত বোধ হইল। তাহার উপর

উঠিয়া দু'চার পা এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বুঝিলাম এতক্ষণে আমার সেই ঈপ্সিত ফুট্‌পাথে পৌঁছিয়াছি।

যাক—তবু ত কিছু পাইয়াছি। দুই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিছুক্ষণ চলিলাম। একটা ভিজা দেয়াল হাতে ঠেকিল। তখন সেই দেয়াল ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল এইভাবে যাইবার পর কাঠের দরজায় হাত পড়িল। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিলাম—এতক্ষণে বুঝি দুঃখ সাগরে কূল মিলিল।

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। তারপরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম—'কে আছ দোর খোল' 'মশায় দয়া করে একটিবার দোর খুলুন' 'ওহে কেউ শুন্‌তে পাচ্ছ, একবার দরজাটি খুলবে?' কিন্তু কোথায় কে? দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রহিল। বাড়ীর ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না। শুধু আমার আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া-একটা নিঃসঙ্গ প্রেতযোনির মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্ববৎ দেয়াল ধরিয়া আবার আর একটা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। দরজা খুলিল না,—এমন কি দরজার অন্তরালে কোথাও যে লোক আছে, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। আরও দুই তিনটা দরজা এমনিভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—ফলের কোনও তারতম্য হইল না।

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,-—মনও উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হইয়া গেল। যদি কলিকাতার সবাই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? এখন কোথাও একটু শুইবার জায়গা পাইলে আর কিছুরই আমার দরকার নাই। জলের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা দু'টা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—যদি মরিতেই হয় তবে কোনও একটা শুষ্ক স্থানে পা ছড়াইয়া শুইয়া মরিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু পা ছড়াইয়া শুইবার মত স্থান এই প্রলয়-প্লাবিত কলিকাতা সহরটার মধ্যে কোথায় পাওয়া যায়? ফুট্‌পাতের ওপরেও ও প্রায় এক ফুট্ জল!

যাহ'ক, এরকমভাবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। মন যতই অবসাদে ডুবিয়া যাইতে চাহিল, ততই তাহাকে জোর করিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে লাগিলাম। একটা কিছু সুরাহা হইবেই। এমন কখনো হইতে পারে যে কোনও বাড়ীর লোক সাড়া দিবে না? হয়ত এখনই একটা বিলম্বিত ভাড়াটে গাড়ী কিম্বা একজন আলোকধারী পথিক আসিয়া পড়িবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোনও অভাবনীয় উপায়ে অন্ধ হইয়া যাই নাই ত। নহিলে একি সম্ভব যে এতক্ষণ ধরিয়া এই

দু'চক্ষে একটা কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ? এত অন্ধকার কি হইতে পারে ? হয়ত সেই যখন জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম—

দু'চক্ষু সজোরে কচ্লাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু চক্ষুর দুর্ভেদ্য তিমির দূর হইল না। হঠাৎ মনে হইল দেশলাই জ্বালিয়া দেখিনা কেন! দু'পকেট খুঁজিলাম, দেশলাই নাই। দেশলাই যে জুলপিকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

যেন পাগলের মত হইয়া গেলাম। অন্ধ হইয়া গিয়াছি কিনা এ সন্দেহটা তখনি যেমন করিয়া হোক ভঞ্জন করিতেই হইবে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহেনা! আর একটা দরজার সম্মুখে গিয়া দু'হাতে তক্তার উপর চাপড়াইতে লাগিলাম;—'ও মশায়, কে আছেন একটিবার দোর খুলুন না। ও মশায়!'

পিছন হইতে শান্তস্বরে কে বলিল;—'মিছে চেঁচামেচি করছেন—এখানে কি লোক আছে যে উত্তর দেবে! এ গুলো সব দোকান।'

আমি যেন আঁতকাইয়া উঠিলাম; 'অ্যাঁ—কে—কে—কে?'

'কোন ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে। আমার হাত ধরুন।'

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। একখানা হাত—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—আমার আঙ্গুলগুলা চাপিয়া ধরিল। আমার পা হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত যেন একবার অসহ্য শীতে কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁতে ঠুকিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল।

আমি বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমি কি অন্ধ হ'য়ে গেছি?'

ছোট্ট একটি হাসির শব্দ হইল।

'না, ভারি অন্ধকার তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম,—'আমার বাড়ী বাদুড় বাগানে।'

'আচ্ছা'।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। অদৃশ্য আগন্তুক স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে আমাকে সব রকম বাধা-বিঘ্ন বাঁচাইয়া লইয়া চলিল। আমার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম;—'আচ্ছা, এই অন্ধকারে আপনি ত বেশ দেখতে পাচ্ছেন।'

কোনও উত্তর পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আমি দর্ম্মাহাটার একটা দোকানে চা খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়েছিলাম, বলতে পারেন!'

উত্তর হইল;—'আপনি নিমতলা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।'

নিমতলা ঘাট! সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আপনি কে? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম—শুনে আপনার লাভ নেই।—এদিকে দিয়ে ঘুরে আসুন, ওখানে একটা ম্যানহোল খোলা আছে। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ওর মধ্যে যদি আপনি গিয়ে পড়েন তাহলে আর—'

সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

অল্পকাল পরে আমার দিব্যচক্ষুষ্মান পথ-প্রদর্শক বলিল;—'অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। সহরের মাঝখানে, ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ী ঘিরে প্রায় দেড় মানুষ জল জমেছে। আপনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।'

আমি নিঃশব্দে পথ চলিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলাম— 'কলকাতা সহরটা মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হ'য়ে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষ নেই—'

'ও রকমটা মনে হয়। সহরের প্রাণ হচ্ছে তার রাস্তাঘাট। সেখানে মানুষ না থাকলে শ্মশান আর সহরে কোন তফাৎ থাকে না।'

আমি কতকটা নিজের মনেই বলিলাম;—'মনে হচ্ছে যেন এটা ভূতের রাজ্য'।

হাসির শব্দ হইল।

'এই রকম রাত্রে ভূতেদের ভারি ফুর্ত্তি হয়—কি বলেন?—আচ্ছা আপনি যখন একলা দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন যদি একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হ'ত, আপনি কি কর্‌তেন বলুন দেখি?

'কি কর্‌তাম? বোধহয় দাঁত কপাটি লেগে মারা যেতাম।'

'হা হা হা হা! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! আচ্ছা, ভূতকে এত ভয় কিসের বলুন দেখি? একটা লোক মরে গেছে বৈ ত নয়?'

'বলেন কি মশায়! ভূত হল গিয়ে একটা—প্রেতাত্মা। তার চালচলন রীতিনীতি স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই—ভয় কর্ব্বে না?'

'তা বটে।—আচ্ছা মনে করুন—না থাক—'

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠিল। এ কাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছি?

তবু মনে সাহস আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম;—'আপনার নাম ত বল্লেন না। কোথায় থাকেন বলবেন কি?'

'কোথায় থাকি? যেখানে দেখা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি থাকি।'

'আজ আমার যে উপকার করলেন, জন্মেও তা ভুলব না। আবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয়!'

'দেখা—বোধহয়—আর হবে না—তবে যদি আবার কখনো এমনি বিপদে পড়েন—হয়ত···'

'আচ্ছা আপনি কি করেন? কোন কাজকর্ম্ম করেন নিশ্চয়—তাও কি বলতে দোষ আছে?'

'আমি কিছু করিনা, এমনি ঘুরে বেড়াই—বেকার।'

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ।......

'আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব ভাল আছে—কোন ভাবনা নেই।'

আমি চমকাইয়া উঠিলাম।

'আপনি আমার মনের কথা জান্‌লেন কি করে?'

আবাঁর হাসির শব্দ হইল।

'এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে স্বভাবতঃ কি চিন্তা আসে তা আন্দাজ করা কি খুব শক্ত?'

'না—তা বটে। কিন্তু—কিন্তু—আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে, আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটাও আন্দাজ।'

দীর্ঘ নীরবতা। এ কে? কোন জগতের অধিবাসী?

আমি মরিয়া হইয়া আরম্ভ করিলাম,—'দেখুন—'

'ওকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।'

আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম;—'আ—আ—আমায় ছেড়ে দিন—আমি—' গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না।

'ভয় পাবেন না—এতক্ষণ যখন এসেছেন, তখন আরও খানিকটা আসুন। আপনার বাড়ী প্রায় এসে পড়েছে।'

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল, গলা এমন ভাবে বুজিয়া গেল যেন শত চেষ্টা করিয়াও একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিব না। বরফের মত হাতখানা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সহসা শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল। সে দাঁড়াইল; আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার আপনি একলাই যেতে পার্ব্বেন। এখান থেকে গুণে একশ' পা এগিয়ে যান, গিয়ে ডানদিকে ফিরলে সামনেই দরজা পাবেন—সেই আপনার বাড়ী। ভোর হয়ে আসছে,—এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় হাসির শব্দ হইল; কিন্তু এবার যেন শব্দটা বড় ব্যথাপূর্ণ।

সে বলিল,—'আপনি বড় ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা চল্লাম তবে; এই নিন আপনার ছাতা, জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই—আচ্ছা—বিদায়।' শেষ কথাটা যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত মিলাইয়া গেল।

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আছেন কি?'

উত্তর আসিল না।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম—অতি দূরে পূর্ব্ব আকাশের পুঞ্জিত মেঘ ভেদ করিয়া অল্প একটুখানি ফ্যাকাশে আলো দেখা দিয়াছে। ১৩৩৭

√মুখোস

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই যে মুখে মুখোস পরিয়া ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই গূঢ় তত্ত্বটির প্রতি সাধারণের সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমি আপাততঃ মাত্র চারিটি চরিত্র নমুনাস্বরূপ সর্ব্বসমক্ষে হাজির করিতেছি, আশা করিতেছি এই চারিটি ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবর আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও নরেশবাবু শরীরটাকে দিব্য তাজা রাখিয়াছিলেন, চুলও যাহা পাকিয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁহার সৌম্য সুদর্শন চেহারাখানি দেখিলে তাঁহাকে একটি পরম শুদ্ধাচারী ঋষি বলিয়া মনে হইত। অবশ্য গোঁফদাড়ির হাঙ্গামা ছিল না, তিনি প্রত্যহ সযত্নে ক্ষৌরকার্য্য করিতেন; সুচিক্কণ মুণ্ডিত মুখ মণ্ডলে একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক হাসি সর্বদাই ক্রীড়া করিত। চোখের চাহনীতে এমন একটি স্বপ্নাতুর সুদূর-দুর্লভ আবেশ লাগিয়া থাকিত যে, মনে হইত তাঁহার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর ধূলামাটি হইতে বহু ঊর্দ্ধে ত্রিগুণাতীত তুরীয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছে। মোট কথা তাঁহাকে দেখিলে মানুষের মনে স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভ্রমের উদয় হইত।

নরেশবাবু বিবাহ করেন নাই। সারা জীবন বিদেশে থাকিয়া তিনি ব্যবসাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন; এখন বোধ করি 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া ব্যবসাবাণিজ্য গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। নিরুদ্বেগে শান্তিতে জীবনের বাকী দিনগুলি উপভোগ করিবেন ইহাই ইচ্ছা।

বিদেশ হইতে নরেশবাবু একটি অনুচর সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহার নাম বাঘাবৎ সিং—সংক্ষেপে বাঘা সিং। নামটি যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয় তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায়। বসন্তের গুটিচিহ্ন আঁকা হাঁড়ির মত একটা মুখ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট ধৃষ্টতাভরা চক্ষু দুটি সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, যেন একটা ছুতা পাইলেই টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবে। দেহখানা আড়ে-দীঘে প্রায় সমান। হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কালো রঙের পাঞ্জাবী পরিয়া ও মাথায় প্রকাণ্ড পাগ্ড়ী চড়াইয়া সে যখন বুক চিতাইয়া পথ দিয়া হাঁটে, তখন সম্মুখের ভদ্র পথিক অপমানের ভয়ে সশঙ্কে পথ ছাড়িয়া দেয়। বাঘা সিং নরেশবাবুর পুরাতন ভৃত্য। সে কোনও কাজ করে না, কেবল বাড়ীর সদর দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে; তাহার অনুমতি না লইয়া তাহাকে ডিঙাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে এমন

সাহস কাহারও নাই। সারাদিন টুলের উপর বসিয়া বাঘা সিং পান চিবায়, পানের গাঢ় রস তাহার কস্ বাহিয়া গড়াইতে থাকে; যেন যে কাঁচা মাংস চিবাইতেছে।

নরেশবাবুর বাড়ীটি ছোট, ছিমছাম, দ্বিতল। পাশেই আর একটি ছোট বাড়ী আছে, সেটি একতলা। পুরানো বাড়ী, উপরে কোমর পর্যন্ত পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। এই বাড়ীতে যিনি বাস করেন তাঁর নাম দীননাথ। নিরীহ ভাল মানুষ লোক, সামান্য কেরাণীগিরি করেন। শীর্ণ কোলকুঁজো ধরণের চেহারা, মোটা চশমার ভিতর দিয়া যেভাবে পৃথিবীর দিকে তাকান তাহাতে মনে হয় তিনি পৃথিবীকে ভয় করিয়া চলেন। পৃথিবী তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করে নাই, অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে চিরদিন পিছনেই ফেলিয়া রাখিয়াছে; তাই তিনিও শামুকের মত সসঙ্কোচে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার পরিবারে যে একটি মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই এজন্যও তিনি মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ সামান্য মাহিনা সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে অনটন নাই। মেয়ের অবশ্য বিবাহ দিতে হইবে কিন্তু সেজন্য দীননাথ চিন্তিত নন; প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলিবে।

মেয়েটির নাম অমলা। বয়স সতেরো বছর; একবার তাহার উপর চোখ পড়িলে আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। নূতন যৌবনের দুর্নিবার বহি-র্মুখিতা পাকা ডালিমের মত তাহার সারা দেহে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, চোখে মুখে চঞ্চল প্রগল্‌ভতা। অমলা নিজের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অচেতন নয়; সে চোখ বাঁকাইয়া তাকায়, মুখ টিপিয়া হাসে, খোলা ছাদে দুপুর বেলা চুল এলো করিয়া চুল শুকায়। রাস্তায় একটু উঁচু শব্দ হইলে সে ছুটিয়া গিয়া ছাদের আলিসার উপর বুক পর্য্যন্ত ঝুঁকাইয়া নীচে রাস্তার পানে তাকাইয়া দেখে; তাহার গায়ের কাপড় সব সময় ঠিক থাকে না, অতি তুচ্ছ কারণে অসম্বৃত হইয়া পড়ে।

নরেশবাবু নিজের দ্বিতলের জানালা হইতে অমলাকে দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মন্তব্যটি ঋষিজনোচিত কি না বলিতে পারি না, কারণ সেকালের মুনিঋষিরা নারীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কিরূপ মন্তব্য করিতেন তাহার কোনও নজির নাই। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ভাষায় উহা একেবারেই অচল। 'ছলনা' শব্দটা অসভ্য ইতরজনের মুখে মুখে অপভ্রষ্ট হইয়া বড়ই বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে।

অমলাও নরেশবাবুকে দেখিয়াছিল। অমলা ছাদে উঠিলেই নরেশ বাবু নিজের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন; আকাশের পানে এমন মুগ্ধ ভাবে তাকাইয়া থাকিতেন যেন ঐ দুরবগাহ নীলিমার মধ্যে তাঁহার সাধনার পরম বস্তুকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে চক্ষু নীচের দিকে নামিত, মুখের হাসিটি আরও

মুগ্ধ-মধুর হইয়া উঠিত। অমলার মনে বোধ করি শ্রদ্ধার উদয় হইত; সে সঙ্কুচিতভাবে গায়ের কাপড় সামলাইয়া, চলন ভঙ্গীকে অতিশয় মন্থর করিয়া, পিছনে দু'একটি চকিত দৃষ্টি হানিতে হানিতে নীচে নামিয়া যাইত।

দীননাথ এসবের কিছুই খবর রাখিতেন না। অফিস হইতে ফিরিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইয়া যাইত; তাড়াতাড়ি একপেয়ালা চা ও কিছু জলখাবার গলাধঃকরণ করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের জানালার পাশে তক্তপোষে গিয়া বসিতেন, তাক হইতে একটি পেঙ্গুইনমার্কা ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পাড়িয়া লইয়া তক্তপোষের উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অমলা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলে তিনি নির্ব্বিচারে হুঁ দিয়া যাইতেন, কারণ কথাগুলি তাঁহার এক কানে দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত, ক্ষণেকের জন্যও মস্তিষ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন অমলা বলিল,—'বাবা, পাশের বাড়ীতে নতুন ভাড়েটে এসেছে তুমি দেখেছ ?'

দীননাথ বলিলেন,—'হুঁ।'

অমলা বলিল,—'আমিও দেখেছি—বোধহয় খুব সাধু লোক। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন।'

হুঁ।'

'ঝি বলছিল ওঁর বাড়ীর দরজায় একটা দুষমনের মত লোক বসে থাকে, দেখলেই ভয় করে।'

'হুঁ হুঁ' বলিয়া দীননাথ বইয়ের পাতা উল্টাইলেন—

এমনি ভাবে কয়েক হপ্তা কাটিবার পর একদিন সকাল বেলা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়া অমলা দেখিল, একটি কাগজের মোড়ক ছাদে পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একটি রাঙা টক্‌টকে গোলাপফুল। অমলা চোখ বাঁকাইয়া জানালার দিকে তাকাইল; নরেশবাবু স্নিগ্ধ হাসি হাসি মুখে আকাশের পানে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার গায়ে চাঁপা রঙের একটি সিল্কের কিমোনো সদ্যঃস্নাত তরুণ তাপসের অঙ্গে গৈরিক বসনের মত শোভা পাইতেছে।

ফুলটিকে অমলা পূজার নির্ম্মাল্য বলিয়া মনে করিল কিনা কে জানে; সে নরেশবাবুর দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, তারপর ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সেটি খোঁপায় গুঁজিল। নরেশবাবু একবার চক্ষু নামাইলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিলেন। লোহা গরম হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার মুখের হাসি আরও স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

*　　*　　*　　*

অফিসে বড় সাহেবের শাশুড়ী মারা গিয়াছিল, এই আনন্দময় উপলক্ষে অর্দ্ধদিনের ছুটি পাইয়া দীননাথ দ্বিপ্রহরেই বাড়ী ফিরিলেন। পথে আসিতে একটি ডাব কিনিয়া লইলেন। অমলা ডাব খাইতে চাহিয়াছিল, অমলা চিনি দিয়া ডাবের কচি শাস খাইতে ভালবাসে; ডাবের জলটা দীননাথ পান করেন।

বাড়ী আসিয়া দীননাথ ধড়াচূড়া ছাড়িলেন, তারপর দা লইয়া ডাব কাটিতে বসিলেন। অমলা গেলাস চাম্‌চে প্রভৃতি লইয়া কাছে বসিল। দু'জনের মুখেই হাসি। অমলা বলিল,—'খুব কচি ডাব, না বাবা ?'

দীননাথ ডাবের মাথায় এক কোপ বসাইয়া বলিলেন 'হুঁ। তুলতুলে শাস বেরুবে। আমাকে একটু দিস।' অমলা বলিল, 'আচ্ছা। তুমিও আমাকে একটু জল দিও।'

এই সময় সদর দরজার কড়া নড়িল। ঝিয়ের এখনও আসিবার সময় হয় নাই, তবু ঝি আসিয়াছে মনে করিয়া অমলা দ্বার খুলিতে গেল।

মিনিট খানেক পরে অমলা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; তাহার হাতে একটা দশ টাকার নোট ও গোলাপী রঙের একখানা চিঠি। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাপের পাশে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'ও বাবা, এ সব কী দ্যাখো!'

দীননাথ চিঠি পড়িলেন এবং নোট দেখিলেন; তারপর দা তুলিয়া লইয়া তীরবেগে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, চিঠিখানি নরেশবাবুর লেখা এবং নোটখানিও তাঁহারই—বাঘা সিং লইয়া আসিয়াছিল।

নরেশবাবু দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া দীননাথের সদর দরজা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বাঘা সিং উঠিপড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে দা হস্তে দীননাথবাবু। বাঘা সিং বেশী দূর পলাইতে পারিল না, চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল; দীননাথ ডালকুত্তার মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন।

হৈ হৈ কাণ্ড ; লোক জমিয়া গেল। দীননাথ বাঘা সিংয়ের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এলোপাথাড়ি দা চালাইতেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি ক্রোধান্ধ অবস্থায় দা'টি উল্টা করিয়া ধরিয়াছিলেন, ধারের দিকটা বাঘা সিংয়ের গায়ে পড়িতেছিল না। সে কিন্তু পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া চলিয়াছিল—'বাপ রে! জান্ গিয়া! পুলিশ! মার ডালা!—'

নরেশবাবু পাংশু মুখে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কী দুর্দ্দৈব। মেয়েটা তো রাজিই ছিল; কে জানিত মড়া-খেকো বাপ্‌টা ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরিয়াছে এবং তার এত বিক্রম।

ওদিকে অমলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, বালিশে মাথা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত নোংরা মানুষের মন! তাহার সতেরো

বছরের নিষ্পাপ জীবনে এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও ঘটে নাই। আজ এ কি হইল। মানুষের সঙ্গে চোখোচোখি হইলে সে না হাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা কি মন্দ? তবে কেন লোকে তাহার সম্বন্ধে যা-তা ভাবিবে।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৫২

অসমাপ্ত

কয়েকজন নবীন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

তিনি অর্দ্ধমুদিত নেত্রে গড়গড়ার নলে একটি দীর্ঘ টান দিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ টান দিলেন, সে পরিমাণ ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন নল রাখিয়া তিনি বলিলেন—

"আজ কাল তোমাদের লেখায় 'প্রকৃতি' কথাটা খুব দেখতে পাই। পরমা প্রকৃতি এই করলেন; প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এই হল, ইত্যাদি। প্রকৃতি বলিতে তোমরা কি বোঝো তা তোমরাই জানো; বোধ হয় ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়, তাই প্রকৃতি নাম দিয়া একটা নতুন দেবতা তৈরী করে তার ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাও। ভগবানের চেয়ে ইনি এক-কাঠি বাড়া, কারণ, ভগবানের দয়া-মায়া আছে, ধর্ম্মজ্ঞান আছে। তোমাদের এই প্রকৃতিকে দেখলে মনে হয়, ইনি একটি অতি আধুনিকা বিদুষী তরুণী—ফ্রয়েড্ পড়েছেন এবং কুসংস্কারের কোনও ধার ধারেন না। মানুষের ভাগ্য ইনি নির্দ্দয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করছেন, অথচ মানুষের ধর্ম্ম বা নীতির কোনও তোয়াক্কা রাখেন না।

"এই অত্যন্ত চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটির তোমরা নাম দিয়েছ—প্রকৃতি। এঁকে আমি বিশ্বসংসারে অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। একটা অন্ধ শক্তি আছে মানি, কিন্তু তার বুদ্ধি-সুদ্ধি আক্কেল-বিবেচনা কিচ্ছু নেই। পাগলা হাতীর মত তার স্বভাব, সে খালি ভাঙ্তে জানে, অপচয় করতে জানে। তার কাজের মধ্যে কোনও নিয়ম আছে কি না কেউ জানে না; যদি থাকে তাও তোমাদের ঐ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত—অর্থাৎ নিয়ম আছে বটে কিন্তু তার কোন মানে হয় না।"

চাকর কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, শরৎচন্দ্র নলে মৃদু মৃদু টান দিলেন।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, তোমাদের প্রকৃতি আর্টিষ্ট নয়; কিম্বা তোমাদের মত আর্টিষ্ট। তার সামঞ্জস্য-জ্ঞান নেই, পূর্ব্বাপর জ্ঞান নেই। কোথায় গল্প আরম্ভ করতে হবে জানে না, কোথায় শেষ করতে হবে জানে না, নোংরামি করতে এতটুকু লজ্জা নেই, মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই—ছন্নছাড়া নীরস একঘেয়ে কাহিনী ক্রমাগত বলেই চলেছে। একই কথা হাজার বার বলেও ক্লান্তি নেই। আবার কখনও একটা কথা আরম্ভ হতে না হতে ঝপাং করে শেষ করে ফেলছ। মূঢ়—বিবেকহীন—রসবুদ্ধিহীন—

''একবার একটা গল্প বেশ জমিয়ে এনেছিল; ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভণ্ডুল করে ফেললে।

গল্পটা বলি শোন। গৃহদাহ পড়েছ তো, কতকটা সেই ধরণের; তফাৎ এই যে, এ গল্পটা বলেছিল তোমাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ সত্য ঘটনা।

পানা পুকুরের তলায় যেমন পাঁক, আর ওপরে শ্যাওলা, সমাজেরও তাই। পাঁক কুশ্রী হোক, তবু সে ফসল ফলাতে পারে; শ্যাওলার কোনও গুণ নেই। নিষ্ফলতার লঘুত্ব নিয়ে এরা শুধু জলের ওপর ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু তাই বলে এদের জীবনে তীব্রতার কিছুমাত্র অভাব নেই। বরঞ্চ কৃত্রিম উপায়ে এরা অনুভূতিকে এমন তীব্র করে তুলেছে যে, পঞ্চরংয়ের নেশাতেও এমন হয় না। সত্যিকার আনন্দ কাকে বলে তা এরা জানে না, তাই প্রবল উত্তেজনাকেই আনন্দ বলে ভুল করে; সত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই, তাই স্বেচ্ছাচারকেই এরা পরম সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

ভূমিকা শুনে তোমরা ভাবছ গল্পটা বুঝি ভারি লোমহর্ষণ গোছের একটা কিছু। মোটেই তা নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে চিরন্তন ত্রিভুজ এও তাই—অর্থাৎ দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। সেই সুরেশ, মহিম আর অচলা।

কিন্তু এদের চরিত্র একেবারে আলাদা! এ গল্পের অচলাটি সুন্দরী কুহকময়ী হ্লাদিনী—হৃদয় বলে তাঁর কিছু ছিল কি না তা তোমাদের প্রকৃতি দেবীই বলতে পারেন। ছিল ভোগ করবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা, আর ছিল ঠমক, মোহ, প্রগল্‌ভতা—পুরুষের মাথা খাওয়ার সমস্ত উপকরণই ছিল।

ওদিকে মহিম ছিল দুর্দান্ত একরোখা গোঁয়ার; যুদ্ধের মরসুমে সে টাকা করেছিল প্রচুর—ধনকুবের বললেও চলে! আর সুরেশ ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ, ভয়ানক কুচুটে—কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে মধ্যবিত্ত। টাকার দিক্ দিয়ে মহিমের সঙ্গে যেমন তার তুলনা হত না। চেহারার দিক দিয়ে তেমনি তার সঙ্গে মহিমের তুলনা হত না। দু'জনে দুজনকে হিংসে করত, বাইরে লৌকিক ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউলে।

এই তিন জনকে নিয়ে পানা-পুকুরের ওপর ত্রিভুজ রচনা হল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। কিছুদিন অচলা এদের দুজনকে খেলালে, তার পর ঠিক করে নিলে কাকে তার বেশী দরকার। সেকালে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজকালকার দিনে যদি কুবের আর কন্দর্প কোনও রাজকন্যের স্বয়ংবর-সভায় আসতেন, তাহলে কুবেরের গলাতেই মালা পড়ত, কন্দর্পকে তীরধনুক গুটিয়ে পালাতে হত।

মহিমের সঙ্গে অচলার বিয়ে হল। সুরেশ বেশ হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে নিল, কারণ সে বুঝেছিল, এ পরাজয় শেষ পরাজয় নয়, মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম চক্কর মাত্র। হয়তো সে অচলার চোখের চাউনি থেকে কোনও আভাস পেয়েছিল।

একটা কথা বলি। প্রেমিকেরা চোখের ভাষা বুঝতে পারে এমনি একটা ধারণা আছে—একেবারে মিথ্যে ধারণা। প্রেমিকেরা কিচ্ছু বোঝে না। স্ত্রীজাতির চোখের ভাষা বুঝতে পারে শুধু লম্পট।

বিয়ের পরে একদিন মহিমের বাগানে চায়ের জলসা ছিল। জমজমাট জলসা, তার মাঝখানে সুরেশ বললে,—"মহিম, তুমি শুনে সুখী হবে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তবে নেহাৎ সিপাহী সেজে নয়; ঠিক করেছি পাইলট হয়ে যাব।"

একটু শ্লেষ করে মহিম বললে,—"তাই না কি! এ দুর্ম্মতি হল যে হঠাৎ?"

সুরেশ হেসে উত্তর দিলে,—"হঠাৎ আর কি, কিছু দিন থেকেই ভাবছি। এ যুদ্ধটাতো তোমার আমার মতন লোকের জন্যেই হয়েছে; অথাৎ আমার মত লোক যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর তোমার মত লোক টাকার পিরামিড তৈরি করবে।"

মহিমের মুখ গরম হয়ে উঠল, কিন্তু সে উত্তর দিতে পারলে না। সে ভারী একরোখা লোক কিন্তু মিষ্টভাবে কথা কাটাকাটিতে পটু নয়।

আকাশে একটা এরোপ্লেন উড়ছিল; তার পানে অলস কটাক্ষপাত করে সুরেশ বললে,—"আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে কিন্তু প্লেন নেই। তোমার প্লেনটা ধার দাও না—যুদ্ধ করে আসি। যদি ফিরি প্লেন ফেরৎ পাবে; আর যদি না ফিরি, তোমার এমন কিছু গায়ে লাগবে না। বরং নাম হবে।"

রাগে মহিম কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে রইল, তারপর কড়া একগুঁয়ে সুরে বলে উঠল—"তোমাকে প্লেন ধার দিতে পারি না, কারণ আমি নিজেই যুদ্ধে যাব ঠিক করেছি।"

বলা বাহুল্য, দু'মিনিট আগেও যুদ্ধে যাবার কল্পনা তার মনের ত্রিসামানার মধ্যে ছিল না।

মাস দুয়ের মধ্যে মহিম সব ঠিক-ঠাক করে এরোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধে চলে গেল। যাবার সময় উইল করে গেল, সে যদি না ফেরে অচলা তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

সুরেশের কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হল না। বোধ করি, ধারে এরোপ্লেন পাওয়া গেল না বলেই তার যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া ঘটে উঠল না।

বর্ম্মার আকাশে তখন যুদ্ধের কাড়া-নাকড়া বাজছে; বেঁটে বীরেরা হু-হু করে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষেও গেল-গেল রব। যারা পালিয়ে আসছে তাদের মুখে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প।

মহিম ফ্রণ্টে যুদ্ধ করছে। তিন মাস কাটল। এ দিকে মহিমের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই উৎসব চলেছে; গান বাজনা নাচ নৈশ-ভোজন। স্বামীর কথা ভেবে ভেবে অচলার মন ভেঙ্গে না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো!

সেদিকে সুরেশ খুবই দৃষ্টি রাখে; সর্ব্বদাই সে অচলার সঙ্গে আছে। দুপুর রাত্রে যখন আর সব অতিথিরা চলে যায়, তখনও সুরেশ অচলাকে আগলে থাকে। যেদিন অতিথিদের শুভাগমন হয় না, সে দিন সুরেশ একাই অচলার চিত্ত-বিনোদন করে। ক্রমে লোকলজ্জার আড়াল আবডাল ও আর কিছু থাকে না, তোমাদের প্রকৃতি দেবী ব্যাপারটাকে নিতান্ত নির্লজ্জ এবং শ্রীহীন করে তোলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিম নিয়মিত চিঠি পায়; বন্ধু-বান্ধবের চিঠি, অচলার চিঠি। বন্ধু-বান্ধবের চিঠিতে ক্রমে ক্রমে নানা রকম ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিতে লাগল। নিতান্ত ভালমানুষের মত তাঁরা অচলার জীবনযাত্রার যে বর্ণনা লিখে পাঠান তার ভিতর থেকে আসল বক্তব্যটা ফুটে ফুটে বেরোয়। মহিম গোঁয়ার বটে কিন্তু নির্ব্বোধ নয়; সে বুঝতে পারে। অচলার চিঠিতে মামুলি শুভাকাঙক্ষা ও উদ্বেগের বাঁধা গৎ ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না, তাও ক্রমশঃ এমন শিথিল হয়ে আসতে লাগল যে মনে হয়, ঐ মামুলি বাঁধি গৎ লিখতেও অচলার ক্লান্তিবোধ হয়। মহিমের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। মনে মনে গর্জ্জাতে লাগল।

সে ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হল না। যুদ্ধের অবস্থা সঙীন; এখন কেউ ছুটি পাবে না।

এই সময় মিত্রপক্ষের এক দল বিমান শত্রুর একটা ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান করল; মহিমকে যেতে হল সেই সঙ্গে। তুমুল আকাশ-যুদ্ধ হল। মিত্রপক্ষের কয়েকটা বিমান ফিরে এল, কিন্তু মহিম ফিরল না। তার জ্বলন্ত প্লেনখানা উল্কার মত যুদ্ধের আকাশে মিলিয়ে গেল।

মহিমের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলিকাতায় পৌঁছুল, তখন পানা পুকুরের মাঝখানে ঢিল ফেলার মত বেশ একটা তরঙ্গ উঠ্‌ল। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়, আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অচলা কালো রঙের শোক-বেশ পরল কিছু দিনের জন্য; তার পর মহিমের উইল অনুসারে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার সম্পত্তির খাস মালিক হয়ে বসল। সুরেশ এত দিন একটা আলাদা বাড়ী রেখেছিল, এখন খোলাখুলি এসে মহিমের বাড়ীতে বাস করতে লাগল। যার টাকা আছে তাকে শাসন করে কে? দু'জনে মিলে এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যা দেখে বোধ করি 'ভেলু'রও লজ্জা হয়।

মহিম কিন্তু মরেনি। তার আহত প্লেনখানা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে এসে আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল। মহিমের চোট লেগেছিল বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। তার পর সে কি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশী মাইল হাঁটা-পথ চলে শেষ পর্য্যন্ত রেলপথে কলকাতা এসে পৌঁছল, তার বিশদ বর্ণনা করতে গেলে শিশু-সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা সে কলকাতায়

ফিরে এল। সে যে মরে নি এ খবর সে মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাল না; তার বেঁচে থাকার খবর কেউ জানল না।

কলকাতায় এসে সে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে ছদ্মনামে ঘর ভাড়া করে রইল।

সেই দিনই সে সংবাদপত্রে একটা খবর দেখল—মহিমের বিধবা রেজেষ্ট্রী অফিসে সুরেশকে বিয়ে করেছে; আজ রাত্রে তার বাড়ীতে এই উপলক্ষে ভোজ। সহরের গণ্যমান্য সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

মহিম ঠিক করল, আজ রাত্রে ভোজ যখন খুব জমে উঠবে, তখন সে গিয়ে দেখা দেবে।

ভেবে দেখো ব্যাপারটা। চরিত্রহীনা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর দু'মাস যেতে না যেতেই স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিয়ে করেছে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ স্বামী চলেছে প্রতিশোধ নিতে। গল্প জমাট হয়ে একেবারে চরম ক্লাইমেক্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পর কি হল বল দেখি?

কিছুই হল না।

মহিম সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ীতে যাবার জন্য যেই রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি এক মিলিটারী লরি এসে তাকে চাপা দিলে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল, তার মুখখানা এমন ভাবে থেঁতো হয়েগেল যে, তাকে সনাক্ত করবার আরকোন উপায় রইল না।

ওদিকে অচলার বাড়ীতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজ চলল। গণ্যমান্য অতিথিরা আশী টাকা বোতলের মদ খেয়ে রাত্রি তিনটের সময় হর্ষধ্বনিকরতে করতে বাড়ী ফিরলেন। কত বড় একটা ড্রামা শেষ মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে গেল, তা তারা জানতেও পারলে না।

তাই বলছিলুম, তোমাদের প্রকৃতি সত্যিকার আর্টিষ্ট নয়। ক্লাইমেক্স বোঝে না, poetic justice জানে না—কেবল নোংরামি আর বাজে কথা নিয়ে তার কারবার। সত্যি কি না তোমরাই বল।

শরৎচন্দ্র নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা বিলম্বিত টান দিলেন; কিন্তু কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় পুড়িয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, ধোঁয়া বাহির হইল না।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

/গোপন কথা

প্রথম নাতিনী হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বহুদূরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম।

প্রথম নাতিনী হইলে মনের ভাব কেমন হয়, তাহার বর্ণনা করিব না; সুহৃদ্বর তারাশঙ্কর সম্ভবত তাঁহার স্বীয় মনঃসমীক্ষণের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন;—পঞ্চদশ বৎসর পরে তাঁহার নাতিনীটি পঞ্চদশ বৎসরের হইবে, এই সুমধুর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তিনি বিভোর, ইহা আমরা জানি। সুতরাং অলমিতি।

ট্রেনে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এখনও অর্দ্ধেক বাকি। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল; আমি বোধ করি নবীনা নাতিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাশের প্লাটফর্মে উল্টা দিক হইতে একটা গাড়ি আসিয়া থামিতে সচেতন হইয়া উঠিলাম।

দুই গাড়ির মধ্যে হাত দুই-আড়াই ব্যবধান। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই ও-গাড়ির জানালায় একটি মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। যুবতী নয়, বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে ; ভারিভুরি গড়ন। কিন্তু মুখ হইতে যৌবনের কমনীয়তা সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। শাড়ির চওড়া লাল পাড় কাঁধের উপর খসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখটিকে যেন অপরাহ্ণের অস্তরাগে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও-গাড়ির ভিতর দিকে বোধ হয় আরও দুই-চারিটি স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু আমার চোখে তাঁহারা অস্পষ্ট পশ্চাৎপটের মত আবছায়া হইয়া রহিলেন; আমি কেবল এই মহিলাটির দিকেই বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি প্রথমটা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, আবার যেন দ্বিগুণ আগ্রহভরে আমার মুখের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নির্লজ্জ উৎকণ্ঠায় পরস্পর মুখের পানে তাকাইয়া আছি। কিন্তু—সত্যই কি অপরিচিত ? তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ খুলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্মুখের দুইটি দাঁতের মধ্যে একটি অপরটির উপর সামান্য অনধিকার অভিযান করিয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের রুদ্ধ কবাট মুহূর্ত্তে খুলিয়া গেল; একসঙ্গে অনেকগুলা কথা হুড়মুড় করিয়া কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু কোনটাই বাহির হইতে পাইল না। এই সময় হেঁচকা দিয়া আমার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকাল জড়বৎ বসিয়া রহিলাম, তারপর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, গোপন কথা।

তিনি তখন দূরে সারিয়া যাইতেছেন; দেখিলাম, শাড়ির লালপাড় আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া হাসিলেন, তারপর সঙ্কেত-ভরা একটা তর্জ্জনী তুলিয়া ঠোঁটের উপর রাখিলেন। পঁচিশ বছরের পুরানো একটি দিন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ওই হাসি ও সঙ্কেতের মর্ম্ম আমরা দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

গোপন কথা! একটি নবীন যুবক ও একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা নব-যুবতীর মধ্যে একদিন একটি নির্জ্জন স্থানে কিছু গোপন কথার বিনিময় হইয়াছিল। নিন্দনীয় কথা নয়, জানিতে পারিলে পুলিসে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এমন কথা নয়—তবু গোপন কথা! শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া এই কথাটি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে; ইহজীবনে যে নারীটির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তাঁহার কাছেও কোনদিন প্রকাশ করি নাই। পাঠকের হয়তো কৌতূহল হইতেছে, কি এমন গোপন কথা। কিন্তু বলিব না। হয়তো তাহার মধ্যে একটু অম্লমধুর কৌতুকের রস ছিল, হয়তো যৌবনের অর্থহীন চপলতা ছাড়া তাহাতে আর কিছুই ছিল না। তবু বলিতে পারিব না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি এই গোপন কথার অংশভাগিনী ছিলেন, যিনি এই মাত্র চকিতের জন্য দেখা দিয়া কোন্ অজানা নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গেলেন, যাঁহার সহিত ইহজীবনে বোধ হয় আর কখনও চোখোচোখি হইবে না, তিনিও এই কথা সযত্নে অতি সন্তর্পণে সকলের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; যে পুরুষটির সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাকেও একটি কথা বলেন নাই।

মনটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দূরভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন দূরতর অতীতের পানে ফিরিয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! শুধু অতীত আর ভবিষ্যৎ লইয়াই কি তাহার অস্তিত্ব? বর্ত্তমান কতটুকু? স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে দ্রুতসঞ্চরমান একটি বিন্দু! তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, এক ফোঁটা পারার মত কেবলই সে পিছলাইয়া হাতের বাহিরে চলিয়া যায়, ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়া দৃষ্ট নিসর্গের মত মুহূর্ত্তে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অদৃশ্য হয়——

আমার নাতিনী যখন পনরো বছরের হইবে, তখন তাহার কানে কানে আবার গোপন কথাটি বলিব কি? না, বলিব না। অতীতের এই সামান্য কথাটি ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য অকথিত থাকিয়া যাইবে। এই-খানেই আমাদের গোপন কথার পরম পরিপূর্ণতা।

*   *   *   *

স্থানটি লোকালয় হইতে দশ-বারো মাইল দূরে। পাহাড় আছে, ভগ্ন-স্তূপ আছে, একটি মুখরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণী আছে—আর আছে তন্দ্রানিবিড়

মুগ্ধ নির্জ্জনতা। একদিন ফাগুনের আরম্ভে একটি কবোষ্ণ দ্বিপ্রহরে বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া একাকী এই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

স্থানটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সুদূর অতীত যেন কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধার মত সংসারের কাজ শেষ করিয়া একান্তে বসিয়া ঝিমাইতেছে; আর তাহার কর্ম্ম নাই, কর্ম্মে আসক্তিও নাই, হয়তো তাহার স্বপ্নের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি ছায়ার মত আনাগোনা করে। ভাঙা পাথরের ভূমিশয়ান মূর্ত্তির উপর দিয়া শিকারসন্ধী বন্য গিরগিটি যখন সরসর করিয়া ছুটিয়া যায়, বুড়ী তন্দ্রার মধ্যে একটু উসখুস করে—

কিন্তু সেদিন আমার মনে ঐতিহ্যের রস ভাল করিয়া জমিতে পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুইটা কোকিল ভগ্ন স্তূপের দুই প্রান্তের কোন্ পল্লব-পুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বড় তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একটি তার্কিকের মেজাজ কিছু কড়া, অপরটি মৃদু ব্যঙ্গ-প্রিয়। একজন যতই মোলায়েম সুরে ব্যঙ্গ করিতেছিল, অন্যটি ততই ঝাঁঝিয়া উঠিয়া রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি লইয়া তর্ক তাহা অনুমান করিতে পারি নাই, কিন্তু লক্ষ্যহীন-ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ঈষৎ কৌতুকের সহিত মনে হইয়াছিল, বুড়ী কাজ শেষ করিয়া যতই ঝিমাক, পৃথিবীতে যৌবন বসন্ত ও কোকিলের কাজ কোনও দিনই শেষ হইবে না।

তার্কিকদের তর্ক ক্রমশ উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ এক সময় একটা ভাঙা মন্দিরের মোড় ঘুরিয়া দেখিলাম, ব্যঙ্গপ্রিয় কোকিলটি পাখী নয়—একটি মেয়ে। তাহার উৎকণ্ঠনিঃসৃত কুহুধ্বনি আমাকে দেখিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

মেয়েটি মন্দিরের দেয়ালে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে; আমার পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, আপনি কোথা থেকে এলেন?

আমিও কম অবাক হই নাই। তাহার বয়স ষোল কি সতরো; দীঘল তন্বী, মুখখানি মোমের মত সুকুমার, গলাটি মিষ্ট; কিন্তু কোকিলের গলা যে অবিকল নকল করতে পারে, তাহার গলা সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য। আমি বলিলাম, আমি ভেবেছিলাম আপনি কোকিল।

সে হাসিল। সম্মুখের একটি দাঁতের উপর অন্য দাঁতটি একটু অনধিকার অভিযান করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলাম। সে মৃদু তরল কণ্ঠে বলিল, আপনি বুঝি অন্য কোকিলটা?

সত্যকার অন্য কোকিলটা অপর পক্ষের সাড়া না পাইয়া থামিয়া গিয়াছিল, এখন সহসা বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কয়েকবার দ্রুতচ্ছন্দে ডাকিয়া উঠিল, কু-কু-কু-কু-কু—

দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম।

তারপর ভাব হইতে বিলম্ব হয় নাই। এত শীঘ্র এত ভাব হইয়া গিয়াছিল কি করিয়া এখন ভাবি। এ দেশটা বিলাত নয়, অন্ততঃ তখনও বিলাত হইয়া উঠে নাই। অনাত্মীয়া যুবতীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার অভ্যাসও ছিল না। অথচ মুহূর্ত্তের জন্যও বাধোবাধো ঠেকে নাই। বালক-বালিকা যেমন সহজ প্রীতির সহিত কিছুমাত্র আত্মসচেতন না হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, আমরাও তেমনই মিলিত হইয়াছিলাম। তাহার নাম তটিনী; সে সপরিবারে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; আর সকলে দুই মাইল দূরে আর একটা ভগ্নস্তূপ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তটিনী কিন্তু অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে এখানে বসিয়া কোকিলের সহিত কলহ করাই অধিক উপাদেয় মনে করিয়াছে— এসব কথা পরিচয়ের আরম্ভেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমিও পরিচয় দিতে কাপণ্য করি নাই।

সেদিন বসন্তের বাতাস আতপ্ত আলিঙ্গনে আমাদের জড়াইয়া লইয়াছিল। কোকিল তো ডাকিয়াছিলই; কয়েকটা নবজাত প্রজাপতি চারিপাশে নাচিয়া নাচিয়া অকারণ চটুলতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার স্মৃতির মঞ্জুষায় যে কথাটি আজও আমার মনে আনন্দের প্রভা বিকিরণ করিতেছে তাহা এই যে, বসন্ত আমাদের জয় করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু বসন্তসখার দেখা সে দিন পলকের জন্যও পাই নাই। বাঙালীর স্বর্গে কৌতুকের কোনও দেবতা আছেন কিনা জানি না; সম্ভবতঃ আছেন, কারণ তিনিই সেদিন আমাদের যৌবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

দুইজনে ছুটোছুটি করিয়াছিলাম; লুকাচুরি খেলিয়াছিলাম; নির্ঝরিণীর ধারে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়াছিলাম। এমন স্বাদু ও এত শীতল জল আর কখনও পান করি নাই। সেই ঝরনার জলের স্বাদ আজও আমার মুখে লাগিয়া আছে।

ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

আপনি এবার চ'লে যাবেন?

হাঁ। দূরে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ওঁরা এসে পড়বার আগেই চ'লে যাই। নইলে আজকের এই নিখুঁত দিনটার ওপর দাগ প'ড়ে যাবে।— আচ্ছা, চললুম।

অকপট সৌহার্দ্দ্যে তাহার পানে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। সে আমার হাতখানা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল।

আর কখনও আমাদের দেখা হবে না।

সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাল।

হ্যাঁ। আজকের দিনটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল।

এস, এক কাজ করি। তা হ'লে কেউ কাউকে ভুলব না। আমি তোমাকে আমার একটি গোপন কথা বলি, তুমি আমাকে একটি গোপন কথা বল। কিন্তু শপথ রইল, কেউ কোনদিন আর কারুর কাছে এ কথা বলব না।

সে ক্ষণকাল ভাবিয়াছিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আচ্ছা।

আমি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একটি গোপন কথা বলিয়াছিলাম—শুনিয়া সে চকিত সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল। তারপর একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া আমার কানে কানে তাহার গোপন কথাটি বলিয়াছিল।

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চলিয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম। সে একটু হাসিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৫০

√দিগ্‌দর্শন

মাঘের সন্ধ্যায় গ্রামের মাথার উপরকার বায়ুস্তরে সাঁঝাল ধোঁয়ার ধূসর আস্তরণ বেশ ভারী হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল; যেন শীতরাত্রির ভয়ে গ্রামটি তাড়াতাড়ি গুটিসুটি পাকাইয়া ভোটকম্বলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

গ্রাম কিন্তু ঘুমায় নাই। ঐ সাঁঝাল ধোঁয়ার মত একটা গুরুভার দুর্ভাবনা গ্রামের দীণতম প্রজা হইতে জমিদার পর্য্যন্ত সকলের বুকের উপর চাপিয়া ছিল। জমিদার বৈকুণ্ঠবাবুকে প্রজারা ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত; কারণ তিনি দরদী লোক ছিলেন, জমিদারীর ভার নায়েব গোমস্তার হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে শহরে গিয়া বাস করেন নাই। তাই সকলের মনেই আশঙ্কা জাগিতেছিল না জানি আজিকার রাত্রিটা কেমন কাটিবে; সুদূর সমুদ্রপার হইতে যে সংবাদ আসিবার কথা তাহা কিরূপ বার্তা বহন করিয়া আনিবে।

গ্রামের মাঝখানে জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়াছে; পরিজন, দাসদাসী চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সকলেই পা টিপিয়া হাঁটিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই, কথা বলিবার একান্ত প্রয়োজন হইলে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে। যেন বাড়িতে কোথাও মুমূর্ষু রোগী অন্তিমশয্যায় পড়িয়া আছে, একটু শব্দ করিলে তাহার শেষ বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটিবে।

সদর বৈঠকখানার ফরাসের উপর জমিদার বৈকুণ্ঠবাবু তাকিয়ায় কনুই রাখিয়া একাকী বসিয়াছিলেন। সম্মুখে দুইটি কাঁচের বাতিদানে মোমবাতি জ্বলিতেছিল। গড়গড়ার নলটি বাঁ-হাতে মুখের কাছে ধরা ছিল, মাঝে মাঝে তাহাতে মৃদু টান দিতেছিলেন। গায়ে একটি জাম রঙের বহরমপুরি বালাপোষ জড়ানো; গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ, বয়স ষাটের কাছাকাছি; মুখে এমন একটি শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বুদ্ধির দীপ্তি আছে যে দেখিলে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া মনে হয়।

বৈকুণ্ঠ শান্তভাবেই বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার বুকের ভিরতটা তোলপাড় করিতেছিল। যখন প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না তখন সময় যেন কাটিতে চায় না—কর্ম্মহীন মুহূর্তগুলা পঙ্গুর মত এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হয়। আজ রাত্রি আটটার মধ্যে বিলাতী 'তার' আসিয়া পৌঁছিবার কথা; বৈকুণ্ঠ তাঁহার ছোট নায়েব প্রফুল্লকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ডাকঘরে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ছয় ক্রোশ দূরে মহকুমার শহরে

টেলিগ্রাফ অফিস; সুতরাং নয়টার পূর্বে কোনক্রমেই সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। প্রফুল্ল অবশ্য বাইসিকেলে গিয়াছে—

বৈকুণ্ঠ দরজার মাথার উপর প্রাচীন ঘড়িটার দিকে তাকাইলেন। সাড়ে ছয়টা। এখনও আড়াই ঘণ্টা দেরি। সময়কে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেওয়া যায় না ?

দশ বছর ধরিয়া জমিদার বৈকুণ্ঠবাবু একটি মামলা লড়িতেছেন। মামুলী মামলা নয়—একেবারে জমিদারীর সত্ত্বাধিকার লইয়া বিবাদ; জিতিলে সর্বস্ব বজায় থাকিবে, হারিলে পথে দাঁড়াইতে হইবে। দশ বৎসর এই মোকদ্দমা স্তরে স্তরে উর্ধতর আদালতে উঠিয়া শেষে একেবারে চরম আদালত বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে পৌঁছিয়াছে। সেখানে কয়েকমাস শুনানী চলিবার পর আজ রায় বাহির হইবার দিন। বৈকুণ্ঠের জীবনে এক মহা-সন্ধিক্ষণ আসন্ন হইয়াছে, তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন অথবা পথের ভিখারী হইবেন, তাহা আজ চরমভাবে নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

অন্দরের ঠাকুরঘরে গৃহদেবতার শীতল ভোগের ঘণ্টি বাজিল। বৈকুণ্ঠ হাতের নল নামাইয়া রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন। আজই কি তাঁহার শেষ পূজা ? কাল প্রভাতে কি তাঁহার গৃহদেবতার পূজার অধিকার থাকিবে না ? অন্য যজমান আসিয়া পূজা করিবে ?

দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া বৈকুণ্ঠ আবার ঘড়ির দিকে তাকাইলেন—ছ'টা পঁয়ত্রিশ। মাত্র পাঁচ মিনিট কাটিয়াছে। আর তো সহ্য হয় না। মাসের পর মাস তিনি নীরবে শান্ত মুখে প্রতীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজ যখন সময় একেবারে আসন্ন হইয়াছে তখন আর তাঁহার মন ধৈর্য্য মানিতেছে না। অসহ্য এই সংশয়। এর চেয়ে যাহোক একটা কিছু হইয়া যাক্।

গত কয়েকমাস ধরিয়া যে প্রলোভনটি তিনি অতি যত্নে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আবার তাঁহার মনের মধ্যে মাথা তুলিল। দেখাই যাক্ না! অদূর ভবিষ্যৎ এখনই তো বর্তমানে পরিণত হইবে—তবে আর ইতস্তত করিয়া কি লাভ। সংশয়ের যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

বালাপোষখানা কাঁধের উপর টানিয়া লইয়া বৈকুণ্ঠ ডাকিলেন—'হরিশ।'

হরিশ জমিদারীর ম্যানেজার। মোটা ধরণের মধ্যবয়স্ক লোক, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা ; গত কয়দিনের দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হরিশ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্বিগ্ন-চক্ষে প্রভুর মুখের পানে চাহিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন,—'কি দাদা ?' নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার গলার স্বর একেবারে বসিয়া গিয়াছে।

বৈকুণ্ঠ তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন, সহজ গলায় বলিলেন,— 'এস, এক বাজি রঙে বসা যাক।'

হরিশের কালিমালিপ্ত চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, —'না না দাদা, কাজ নেই। আর তো ঘণ্টা দুই—'

বৈকুণ্ঠ বলিলেন,—'তাই তো বলছি, এস খেলা যাক। নিষ্পত্তি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তবে আর খবরটা পেতে দেরি করি কেন? এস।'

হরিশ আর না বলিতে পারিলেন না; পাশার ছক পাতিয়া দু'জনে খেলিতে বসিলেন। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠ ও হরিশের মধ্যে একটা গভীরতর সম্বন্ধ ছিল; দীর্ঘ সংশ্রবের ফলে উভয়ে উভয়ের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং সে পরিচয়ে কেহই নিরাশ হন নাই। তাই জীবনের প্রারম্ভে শুষ্ক বৈষয়িকতার মধ্যে যে সম্বন্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল, জীবনের প্রান্তে তাহাই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত হইয়াছে। আজ যদি দুর্নিয়তির চক্রান্তে বৈকুণ্ঠকে পথে দাঁড়াইতেই হয়, হরিশও তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাশা খেলা আরম্ভ হইল। বৈকুণ্ঠের এই পাশা খেলার মধ্যে এক আশ্চর্য্য রহস্য নিহিত ছিল। ত্রিকালদর্শী জ্যোতির্বিদ যেমন নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিতে পারেন, বৈকুণ্ঠও তেমনি পাশা খেলার ফলাফলের দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারিতেন। আজিকারী কথা নয়, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে খেলাচ্ছলেই তিনি এই বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তারপর শতবার ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—পাশার ফলাফল কখনও ব্যর্থ হয় নাই। খেলায় জিতিলে বৈকুণ্ঠ বুঝিতেন আগামী সমস্যার শুভ ফল ফলিবে, হারিলে বুঝিতেন কুফল অনিবার্য্য।

কালক্রমে এই পাশা খেলা তাঁহার জীবনে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোট-বড় কোনও সমস্যা বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনি হরিশের সহিত রঙ খেলিতে বসিতেন। রঙের বাজি ব্যর্থ হইত না। বৈকুণ্ঠ নিঃসংশয়ে মনে অমোঘ ভবিষ্যতের পরীক্ষা করিতেন।

কিন্তু আজিকার এই জীবন মরণ সমস্যার ফলাফল তিনি এই উপায়ে জানিবার চেষ্টা করেন নাই, বারবার ইচ্ছা হইলেও শেষ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। কি জানি কি ফল দেখা যাইবে। যদি সত্যই মোকর্দ্দমায় হারিতে হয়, আগে হইতে জানিয়া দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘ করিয়া লাভ কি?

এতদিন এই বলিয়া মনকে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর পারিলেন না—খেলিতে বসিলেন। খেলার সময় বৈকুণ্ঠ ও হরিশের মধ্যে একটা অকথিত বোঝা-পড়া ছিল, হরিশ ইচ্ছা করিয়া হারিবার চেষ্টা করিবেন না। দুজনেই ভাল খেলোয়াড়, দেখিতে দেখিতে তাঁহারা খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

রাত্রি আটটার সময় খেলা শেষ হইল।

বৈকণ্ঠ হারিলেন।

হরিশ কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বসিয়া রহিলেন, তারপর চোখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন।

বৈকুণ্ঠের মুখখানা পাথরের মত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আবার গড়গড়ার নল হাতে লইয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিলেন। যাক, তাঁহার ভাগ্য-বিধাতা ইহাই তাঁহার জন্য সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সারাজীবন ঐশ্বর্য ও মর্য্যাদার মধ্যে কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে রিক্ত নিঃস্ব বেশে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে। নিরাসক্ত সংসার চাহিয়া দেখিবে, নির্মম শত্রু হাততালি দিয়া হাসিবে। উদরের অন্ন—যাহার জন্য জীবনে কখনও ভাবেন নাই—তাহারই কথা একাগ্র হইয়া ভাবিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রের ক্ষুধিত মুখ দেখিতে হইবে।

ইহার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? ... ...

মর্মান্তিক চিন্তার তিক্ত সমুদ্রে বৈকুণ্ঠ ডুবিয়া গিয়াছিলেন, 'সময়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া তিনি চোখ তুলিলেন।

দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হরিশ প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাইতেছেন, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—হাতে বাদামী রঙের একটা খাম। অসম্বৃত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'দাদা—'তার'—'

বৈকুণ্ঠ করুণনেত্রে হরিশের পানে তাকাইলেন; নিজের দুঃখ ছাপাইয়া হরিশের জন্য তাঁহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিল। বেচারা! তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেও ডুবিল।

গলার স্বর সংযত করিয়া তিনি বলিলেন,—'তুমিই খুলে পড়।'

'না না, আপনি খুলুন, দাদা—' হরিশ স্খলিত পদে আসিয়া বৈকুণ্ঠের পাশে দাঁড়াইলেন—'প্রফুল্ল বলছে—পোষ্ট মাষ্টার নাকি মিষ্টি খেতে চেয়েছে—বলেছে আমরা জিতেছি—'

বৈকুণ্ঠের চক্ষু দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া গেল, তিনি খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'পাগল! প্রফুল্ল ভুল শুনেছে—'

টেলিগ্রাম বাহির করিয়া পড়িলেন, লেখা রহিয়াছে—আন্তরিক অভিনন্দন, আপনি মোকদ্দমা জিতিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠের চারিদিকে পৃথিবীটা একবার ঘুরিয়া উঠিল; তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।... ... ...

সানাই বাজিতেছে, ঢাকঢোল বাজিতেছে। জমিদার বাড়ী আপাদ-মস্তক আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। প্রজারা দলে দলে আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সংকীর্তন করিতেছে, নাচিতেছে, তরজা গাহিতেছে।

অন্দরে মেয়েরা শীত ভুলিয়া হোলি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাত্রি শেষ হইতে চলিল, এখনও বিরাম নাই।

বৈকুণ্ঠ আবার সুস্থ হইয়াছেন, বৈঠকখানা ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়া নল হাতে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতটা এখনও একটু একটু কাঁপিতেছে। অমানুষিক চেষ্টার পর দুস্তর নদী পার হইয়া সাঁতারু যেমন বেলাভূমির উপর লুটাইয়া পড়ে, তারপর আবার সার্থকতার তৃপ্তিতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিতে থাকে—বৈকুণ্ঠের দেহ-মনও তেমনি অসীম তৃপ্তিতে ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিতেছে। ঠাকুর মুখ রাখিয়াছেন। ঠাকুর—ঠাকুর—ঠাকুর—

চারিদিকে উৎসব কোলাহল, প্রিয়জনের মুখে হাসি। কিন্তু তবু এই পরিপূর্ণ সফলতার মধ্যেও বৈকুণ্ঠের জীবনের একটি নিভৃত কোণ যেন সহসা খালি হইয়া গিয়াছে। পাশা খেলার ফল ব্যর্থ হইয়াছে। আর পাশা খেলার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া চলিবে না—কাণ্ডারীর দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হঠাৎ বানচাল হইয়া গিয়াছে।

বৈকুণ্ঠের মনে হইল আজিকার এই পরম পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে একটী আজীবনের বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৫২

যস্মিন দেশে

বোম্বাই সহরটি যে প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ, একথা অবশ্য সকলেই জানেন। কিন্তু এই দ্বীপকে অতিক্রম করিয়া একটি বৃহত্তর বোম্বাই আছে, পীণাঙ্গী রমণীর আঁটসাঁট পোষাক ছাপাইয়া উদ্বৃত্ত দেহভাগের মত যাহা বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

বৈদ্যুতিক রেলের লাইন ও মোটর রাস্তা দুইই পাশাপাশি বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ফাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের ধারে ধারে এক মাইল আধ-মাইল অন্তর ছোট ছোট জনপদ—বোম্বাইয়ের তুলনায় তাহাদের আয়তন সিকি-দুয়ানির মত। এখানে যাঁহারা বাস করেন, প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা খাদ্যান্বেষী পাখীর মত ঝাঁক বাঁধিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা কলরব করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসেন। মেয়েরা বৈকাল বেলা বাহারে থলি হাতে করিয়া বাজার করিতে বাহির হন; উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন নাই, সব মেয়েরাই শব্জী বাজারে গিয়া আলু শাক কাঁকুড় কপি ক্রয় করেন; তারপর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তরুণী, তাঁহারা ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ নিজ 'শেঠ'এর জন্য প্রতীক্ষা করেন। শেঠ আসিলে দু'জনে গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যান।

তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দেখা যায়, পথের দুই ধারে বাড়ীর সম্মুখস্থ অন্ধকার বারান্দায় কাঠের পিঁড়িযুক্ত দোলা দুলিতেছে; অদৃশ্য মিথুনের হাসি-গল্পের মৃদু আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, ক্বচিৎ কোমল কণ্ঠের গান অন্ধকারকে মধুর করিয়া তুলিতেছে। নিবিড় ঘনীভূত জীবনের স্পন্দন—আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন ঝুলাবে।

কিন্তু বৃহত্তর বোম্বাইয়ের এই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহিত আমার গল্পের কোনও সন্ধান নাই।

বোম্বাইয়ের সমুদ্রকূল বহুদূর পর্য্যন্ত অসংখ্য ভাঙা পোর্তুগীজ্ ঘাঁটি দ্বারা কীর্ণ; এককালে তাহারা যে এই উপকূল বাহুবলে দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহার প্রচুর চিহ্ন এখনও সমুদ্রের ধারে ধারে ছড়ানো রহিয়াছে। প্রত্ন-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই ভগ্ন ইট পাথরের স্তূপগুলি বিশেষ কৌতূহলের বস্তু।

বৈদ্যুতিক রেল-লাইনের প্রায় শেষ প্রান্তে ঐরূপ একটা বড় পোর্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। অতি ক্ষুদ্র স্থান, দিনের বেলা ও একান্ত

জনবিরল। দুই চারিটি দোকান, এক-আধটি ইরাণী হোটেল, পোষ্ট অফিস—এই লইয়া একটি লোকালয়; পোর্ত্তুগীজ শক্তির গলিত শবদেহ জীবন্ত লোকালয়ের পাশে পড়িয়া যেন তাহার উপরেও মুমূর্ষার ছায়া ফেলিয়াছে।

শুনা যায় রাত্রি গভীর হইলে এই ভাঙা দুর্গের চারিপাশে নানা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করে। জীবন্ত মানুষ সে-সময় কেহ ঘরের বাহির হয় না; যদি কেহ একান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় ঐ দিকে যায়, অকস্মাৎ বহু ঘোড়ার সমবেত খুরধ্বনি তাহাকে উচ্চকিত করিয়া তোলে, যেন একদল ঘোড়সোয়ার ফৌজ পাশ দিয়া চলিয়া গেল। দৈবক্রমে দুর্গের আরও নিকটে গিয়া পড়িলে সহসা অন্ধকার স্তম্ভশীর্ষ হইতে পোর্ত্তুগীজ শান্ত্রীর কড়া হুকুম আসে—"**Halt! Quem vai la!**"

কিন্তু ভাঙা পোর্ত্তুগীজ দুর্গের ভৌতিক ভয়াবহতার সহিত আমার কাহিনীর কোনও সম্বন্ধ নাই।

দুপুর বেলা বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গী বা দিগদর্শক লইবার প্রয়োজন হয় নাই; যে মারাঠি বন্ধুর গৃহে কয়েকদিনের অতিথিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম তিনি ট্রেণে তুলিয়া দিয়া রাস্তাঘাটের বিবরণ বলিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম কিন্তু দুর্গ পরিক্রমণ শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। চায়ের তৃষ্ণা যথাসময় আবির্ভূত হইয়া মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলাম; একটু ক্ষুধাও যে পায় নাই এমন নয়। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতেছিলাম, মনের মত খাদ্য পানীয় এই নগণ্য স্থানে পাওয়া যাইবে কি না; হয় তো বোম্বাই না পৌঁছানো পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে। এমন সময় চোখ পড়িল রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র একটি ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া হোটেল।

আমিও ইষ্ট ইণ্ডিয়ার লোক, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব কোণে থাকি; তাই বোধ হয় নামটা ভিতরে ভিতরে আমাকে আকর্ষণ করিল। অজ্ঞাত স্থানে নিম্নশ্রেণীর হোটেলের খাদ্য পানীয় উদরস্থ করা হয় তো সমীচীন হইবে না; তবু মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া ভাবিলাম,—দেখাই যাক না; চা যদি উপাদেয় নাও হয় গরম জলে নেশার পিত্তরক্ষা হইবে।

ছোট্ট ঘরে কয়েকটি টিনের টেবিল চেয়ার সাজানো; লোকজন কেহ নাই। পিছনের ঘর হইতে দুইটি স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছিল; আমার সাড়া পাইয়া পুরুষটি বাহির হইয়া আসিল।

বেঁটে দোহারা মজবুত গোছের লোকটি, রঙ্ ময়লা তামাটে ধরণের; পার্শী ও ইরাণী ছাড়া ভারতবর্ষের যে কোনও জাতি হইতে পারে। বয়স আন্দাজ

বত্রিশ-তেত্রিশ। আমার সম্মুখে আসিয়া দুর্ব্বোধ্য অথচ বিনীত ভাষায় কি একটা প্রশ্ন করিল।

ইংরেজীর আশ্রয় লইতে হইল। এ দেশের পনেরো আনা লোক ইংরেজী বুঝিতে পারে এবং দায়ে ঠেকিলে কষ্টেসৃষ্টে ইংরাজী বলিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিতেও পারে।

বলিলাম—"চা চাই।'

লোকটি ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ ভাল কথা। তারপর মোটের উপর শুদ্ধ ইংরেজীতে বলিল,—'কত চা চাই?'

বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। সেও বোধ হয় বুঝিল আমি এ-অঞ্চলে নূতন লোক, তাই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—এখানে এক পয়সায় সিকি পেয়ালা, দুই পয়সায় আধ পেয়ালা, তিন পয়সায় তিন পোয়া এবং চার পয়সায় পরিপূর্ণ এক পেয়ালা চা পাওয়া যায়; আমি যেটা ইচ্ছা ফরমাস করিতে পারি। তারপর আমার বিলাতী বেশভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'যদি কফি চান ভাল কফি দিতে পারি।'

এ দেশের লোকে চায়ের চেয়ে কফি বেশী পছন্দ করে তাহা জানিতাম; কিন্তু চায়ের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ, কফি কদাচিৎ এক-আধ পেয়ালা খাইয়াছি। বলিলাম,—'না, চা আনো।'

লোকটি পূর্ব্ববৎ ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়া পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল; আমি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। নেপথ্যস্থিত ঘরটা বোধহয় হোটেলের রান্নাঘর; সেখান হইতে অবোধ্য ভাষায় স্ত্রীপুরুষের কথাবার্ত্তা ও হাসির আওয়াজ আসিতে লাগিল।

অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। ধূমায়িত পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিলাম—আঃ। চায়ে দুধের অংশ বেশী এবং চায়ের পাতার সঙ্গে অন্যান্য সুগন্ধি মশলাও আছে। তবু স্বাদ ভালই লাগিল।

এই সময়, কেমন করিয়া জানি না, লোকটি আমাকে চিনিয়া ফেলিল। গরম চা পেটে পড়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোধ হয় গুণ গুণ করিয়া একটি খাঁটি বাংলা সুর ভাঁজিয়া ফেলিয়াছিলাম; লোকটি উত্তেজনা প্রখর চক্ষে আমার পানে চাহিল। তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল— 'আপনি বাঙালী?"

উভয়ে পরস্পর মুখের পানে পরম উদ্বেগভরে তাকাইয়া রহিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার। বাঙালীর ছেলে এতদূরে আসিয়া হোটেল খুলিয়া বসিয়াছে। দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছে, 'হাঁ' বলিতে ডাহিনে-বাঁয়ে শিরঃ-সঞ্চালন করিতেছে!

কিম্বা—বাঙালী বটে তো?

বলিলাম,—'হ্যাঁ ।—আপনি ?'

লোকটি একগাল হাসিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার আহ্লাদ ও বিস্ময়ের অবধি নাই। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে এক গঙ্গা কথা বলিয়া গেল—'হাঁ, আমিও বাঙালী মশায়। কিন্তু কি রকম চিনেছি তা বলুন।—আচ্ছা, এদিকে নতুন এসেছেন—না ? বুঝেছি, রুইন্স দেখতে এসেছিলেন। উঃ—কদ্দিন যে বাঙালীর মুখ দেখিনি।—বম্বেতে বাঙালী আছে বটে—কিন্তু! আপনার নিবাস কলকাতাতেই তো ? আমিও কলকাতার লোক মশায়—আদি বাসিন্দা—'

সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল।

'দাঁড়ান—শুধু চা খাবেন না। খাবার আছে—বাংলা খাবার। (একটু লজ্জিত ভাবে) বড় খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সিঙাড়া আর চম্‌চম্ নিজেই তৈরী করেছিলুম। এদিকে তো আর ওসব—

বলিতে বলিতে দ্রুত পিছনের ঘরে প্রবেশ করিল।

অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইবার পর তাহার মোটামুটি পরিচয় জানিতে পারিলাম। নাম তপেশচন্দ্র বিশ্বাস; গত সাত বৎসর এইখানেই আছে। দোকানের আয় হইতে সংসার নির্ব্বাহ হইয়া যায়; সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে, কোনও অভাব নাই। হঠাৎ এতদিন পরে একজন টাট্‌কা স্বজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া সানন্দ উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

তপেশ জাতিতে কায়স্থ কিম্বা ময়রা জানিতে পারা গেল না—জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল—কিন্তু চম্‌চম্ ও সিঙাড়া খাসা তৈয়ার করিয়াছে।

আমাদের চায়ের আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের কাছে গুটি তিনেক যুবতীর আবির্ভাব হইল। এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে, তাহাদের মধ্যে একটি মেমেদের মত স্কার্ট পরিয়াছে, বাকি দুইটির কাছা দিয়া কাপড় পরা। সকলের হাতেই বাজার করিবার থলি; তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কলকণ্ঠে ডাকাডাকি সুরু করিল। তপেশ গলা বাড়াইয়া দেখিয়া হাসিমুখে কি একটা বলিল; সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ঘর হইতেও সাড়া আসিল।

ঘরের ভিতর যে মেয়েটির সহিত তপেশকে কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম তাহাকে এতক্ষণে দেখিলাম। সে থলে হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিল, আমার প্রতি স-কৌতূহল নাতিদীর্ঘ কটাক্ষ-পাত করিল, তারপর তপেশকে দ্রুতকণ্ঠে কি একটা বলিয়া সখীদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটির বয়স কুড়ি বাইশ—নিটোল সুঠাম শরীর; তাহার উপর বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই। এ অঞ্চলের ঘাটি বলিয়া একটি জাতি আছে, তাহারা পশ্চিম ঘাটের আদিম অধিবাসী। এই জাতীয় মেয়েদের মত এমন অপূর্ব্ব সুন্দর

দেহ-গঠন খুব কম দেখা যায়। ইহারা হাঁটু পর্য্যন্ত আঁট-সাঁট কাছা দেওয়া রঙীন শাড়ী পরে, শাড়ীর কিন্তু কোমরের উর্দ্ধে উঠিবার অধিকার নাই; উর্দ্ধাঙ্গের যৌবনোচ্ছলতাকে কেবলমাত্র একটি সস্তা ছিটের কাপড়ের আঙ্‌রাখার দ্বারা অযত্নভরে সম্বৃত করিয়া রাখে। মাথার পরিপাটি কবরীতে ফুলের 'বেণী' জড়াইয়া ইহারা যখন উৎফুল্ল হাসিমুখে পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা তরি-তরকারি বা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে যায়, তখন নবাগতের চোখে তাহাদের এই সহজ ভ্রূক্ষেপহীন প্রগল্‌ভতা একটু বেহায়া মনে হইলেও রসজ্ঞ ব্যক্তির চোখে মাধুর্য্য বৃষ্টি না করিয়া পারে না।

এই মেয়েটি ঠিক ঐ খাটি জাতীয় কি না জানি না; তবে তাহার ভাব-সাব বেশবাস দেখিয়া সেই রূপই মনে হয়। একটি কালো চকিতনয়না হরিণীর মত ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার ক্ষিপ্র চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তপেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এটি কে' ?

টেবিলের উপর চোখ নত করিয়া তপেশ একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'ও আমার স্ত্রী।'

নিজের স্ত্রীর দৈহিক আব্রু সম্বন্ধে বাঙালী অতিশয় সতর্ক; মনে হইল আমার সম্মুখে স্ত্রীর এই স্বল্প-বাস আবির্ভাবে তপেশ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে—কারণ আমিও বাঙালী। মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম,—'এখানে বিবাহাদিও করেছেন তা'হলে?'

'হ্যাঁ, বছর তিনেক হল—' তারপর যেন বিদ্রোহের ভঙ্গীতে একটু বেশী জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল,—'এরা বড় ভাল—এমন মেয়ে হয় না—। এদের মত এমন—!' বাকি কথাটা সমুচিত ভাষার অভাবে উহ্য রহিয়া গেল। বুঝিলাম, বহুবচনটা বাহুল্য মাত্র, তপেশ স্ত্রীকে ভালবাসে; এবং পাছে আমি তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ বিপরীত ধারণা করিয়া বসি তাই তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কথা পাল্টাইয়া দিলাম।

'এতদিন দেশ ছাড়া; দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তুলেই দিয়েছেন বলুন ?'

বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তপেশ বলিল,—'হাঁ, তা ছাড়া আর কি ? সাত বছর ওমুখো হই নি, আর বোধ হয় কখনও হবোও না। কি দরকার বলুন।'

আমি বলিলাম,—'তা বটে। আপনার জন কিম্বা বাড়ী-ঘর-দোর থাকলে তবু দেশে ফেরবার একটা টান থাকে। আপনার বোধ হয়—?'

তপেশ একটু চুপ করিয়া রহিল; তারপর টেবিলের উপর আঙুল দিয়া দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল,—'বাড়ী-ঘর-দোর আপনার জন—সবই ছিল। তবু একদিন হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলুম—' বলিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হয়তো তাহার দেশত্যাগের পশ্চাতে একটা করুণ গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি লুকাইয়া আছে; এমন তো কতই দেখা যায়, স্ত্রী-বিয়োগ বা ঐ রকম কোনও নিদারুণ শোকের আঘাতে মানুষ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে; তারপর কালক্রমে বৈরাগ্য ও শোক প্রশমিত হইলে আবার দেশে ফিরিয়া যায় অথবা অন্য কোথাও নূতন করিয়া সংসার পাতে। তপেশের সম্ভবত ঐ রকম কিছু হইয়া থাকিবে; তারপর ঐ হরিণনয়না বিদেশিনী মেয়েটির আকর্ষণ-জালে জড়াইয়া পড়িয়া দেশের মায়া ভুলিয়াছে।

প্রকৃত তথ্যটা জানিবার কৌতূহল হইতেছিল অথচ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলাম। তাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলাম,—'দেশে বিয়ে-থা করেননি বোধহয়? এখানেই প্রথম?'

তপেশ আমার পানে চোখ তুলিল; চোখ দুটা বিরাগ ও অসন্তোষ ভরা। প্রথমটা ভাবিলাম, আমার গায়ে-পড়া কৌতূহলের ফলেই সে বিরক্ত হইয়াছে; কিন্তু যখন কথা কহিল তখন বুঝিলাম, তাহা নয়; তাহার মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা অতীতের ছায়া। মুখ শক্ত করিয়া সে বলিল,—'দেশেও বিয়ে করেছিলাম। তিনি হয়তো এখনো বেঁচেই আছেন—মরবার ত কোনও কারণ দেখি না। শুনবেন কেন দেশ ছেড়েছি? শোনেন তো বলতে পারি। কিন্তু আগে আর এক পেয়ালা চা এনে দিই, আর গোটা দুই মিষ্টি। কি বলেন?'

তপেশের কাহিনীটা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলিতেছি; কারণ তাহার কথায় বলিতে গেলে শুধু যে অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে তাই নয়, নানা অবান্তর কথার মিশ্রণে এলোমেলো হইয়া পড়িবে। তবে তপেশের মনে যে একটু অবচেতনার গোপন গ্লানি ছিল, গল্প বলিতে বলিতে সে যে নিজের সাফাই গাহিয়া অবচেতনাকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ কথাটা পাঠকের জানা দরকার, নচেৎ তাহার চরিত্রটা অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তপেশ যে একজন অতি সাধারণ সহজ প্রকৃতিস্থ মানুষ এ কথা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

কলিকাতারই কোনও অঞ্চলে তাহার বাস। ছোট্ট একটি নিজস্ব বাড়ী ছিল। বাপ তাহার বিবাহ দিয়াই মারা গিয়াছিলেন, আর কেহ ছিল না। তপেশ আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কোনও মার্চ্চেণ্ট অফিসে কেরাণীর চাকরিতে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুইটি প্রাণী; আর্থিক অভাব ছিল না। কলিকাতার বাসিন্দা বাড়ী-ভাড়া দিতে না হইলে, অতি অল্প খরচে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইয়া লইতে পারে। স্ত্রীটি দেখিতে শুনিতে ভাল। চারি বৎসরে দাম্পত্য জীবনে দুই-জনের মধ্যে গুরুতর অসদ্ভাব কিছু হয় নাই। ছেলেপুলে হয় নাই বটে, কিন্তু সেজন্য কাহারও মনে দুঃখ ছিল না।

সকালবেলা দৈনিক বাজার করিয়া তারপর যথাসময়ে আহারাদি সারিয়া তপেশ অফিসে বাহির হইত। সে বাহির হইয়া যাইবার ঘণ্টা খানেক পরে শুকো ঝি কাজকর্ম্ম সারিয়া চলিয়া যাইত। অতঃপর তপেশের স্ত্রী পাড়া বেড়াইতে বাহির হইত। গায়ে একটা সিল্কের চাদর জড়াইয়া আধ-ঘোমটা দিয়া রাস্তায় নামিত। তারপর এ বাড়ীতে গল্প করিয়া, ও বাড়ীতে তাস খেলিয়া বৈকালে তপেশ বাড়ী ফিরিবার কিছুক্ষণ আগে ফিরিয়া আসিত। তপেশ কিছু জানিতে পারিত না।

এমন কিছু দূষণীয় আচরণ নয়। একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক সারাটা দ্বিপ্রহর একাকিনী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিতে পারিয়া যদি পাড়ার অন্যান্য গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা গল্পে সময় কাটাইয়া আসে, তাহাকে মারাত্মক অপরাধী বলা যায় না। কিন্তু তপেশ যখন একজন প্রতিবেশী বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিল তখন তাহার ভাল লাগিল না। ঘরের বৌ রোজ পাড়া বেড়াইতে বাহির হইবে কেন? তাছাড়া, তাহাকে লুকাইয়া এমন কাজ করা যাহা বাহিরের লোকে জানিবে, এ কেমন স্বভাব?

তপেশ বাড়ী আসিয়া বৌকে খুব ধমক-চমক করিল। বৌ মুখ বুজিয়া শুনিল, অস্বীকার করিল না, কোনও কথার জবাব দিল না।

কিন্তু তাহার পাড়া-বেড়ানো বন্ধও হইল না। কিছুদিন পরে তপেশ আবার খবর পাইল; একটি বন্ধু এই লইয়া একটু মিঠে কড়া রসিকতাও করিলেন। তপেশের বড় রাগ হইল। এ কি কদর্য্য নির্লজ্জতা! ঘরের বৌ দু-দণ্ড ঘরে থাকিতে পারে না! অবশ্য স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই তপেশের হয় নাই, পাড়ার লোকও কেহ এরূপ অপবাদ দিতে পারে নাই। কিন্তু তবু তপেশ বৌকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া চীৎকার ও রাগারাগি করিল। বৌ পূর্ব্ববৎ মুখ বুজিয়া শুনিল।

এমনি ভাবে ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তপেশ বৌকে অনেক বই মাসিক পত্রিকা আনিয়া দেয় যাহাতে দুপুরবেলাটা তাহার গল্পাদি পড়িয়া কাটিয়া যায়, বৌও দু'একদিন বাড়ীতে থাকে; তারপর আবার কোন্ দুর্নিবার আকর্ষণের টানে গায়ে চাদর জড়াইয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। আবার ঝগড়া হয়, তপেশ ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার ভয় দেখায়, তাহাতেও কিছু ফল হয় না।

পাড়ায় এটা একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরা তামাসা করে—'কি রে, তোর সেপাই আজ রোঁদে বেরিয়েছিল?' তপেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—দাঁত কিশ্ কিশ্ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়। তাহার মনে হয়, বৌ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ করিতেছে, তাহার আব্রু ইজ্জত কিছুই আর রহিল না।

শেষে নাচার হইয়া তপেশ বৌকে অতি কঠিন দিব্য দিয়াছিল—আর যদি অমন করে বাড়ী থেকে বেরোও, আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে। বৌ কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তারপর তাহার পাড়া বেড়ানো বন্ধ হইয়াছিল।

তপেশ মনে একটু শান্তি অনুভব করিতেছিল। বৌয়ের শরীরে আর তো কোনও দোষ নাই। এটা একটা বদ্‌-অভ্যাস মাত্র, একবার ছাড়াইতে পারিলে আর ভাবনা নাই।

মাস খানেক পরে একদিন অফিসে মাহিনা পাইয়া তপেশ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল। বাহিরের দরজা ভেজানো; বাড়ীতে বৌ নাই। —তাহার মাথার মধ্যে যেন চিড়িক মারিয়া উঠিল; সে শয়ন ঘরে গিয়া ঢুকিল, সাবেক আমলের একটা বড় মজবুত তালা ঘরে ছিল; সেটা লইয়া সদর দরজায় চাবি দিয়া তপেশ বাহির হইয়া পড়িল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া বম্বের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

সেই অবধি সে দেশছাড়া; বাড়ী অথবা বৌএর কি হইল তাহা সে জানে না, জানিবার ঔৎসুক্যও নাই। পূর্ব্ব জীবনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া সে নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছে।

তপেশের গল্প শেষ হইতে হইতে বেলাও শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। তাহাকে চা জল খাবারের দাম দিতে গেলাম, সে কিছুতেই লইল না। বলিল,—'ও কি কথা—আপনি দেশস্থ লোক—। যদি সুবিধে হয় আর একবার আসবেন কিন্তু।'

দরজার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলাম,—'কৈ তোমার স্ত্রী তো এখনো ফিরে এলেন না!'

তপেশ বলিল,—'তাড়া তো কিছু নেই, বাজার ক'রে একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে ফিরবে—' বলিয়াই সচকিতে আমার মুখের পানে চাহিল।

আমি অবশ্য কিছু ভাবিয়া বলি নাই, কিন্তু নিরীহ প্রশ্নের আড়ালে কোনও অজ্ঞাত খোঁচা খাইয়া তপেশ প্রথমটা একটু থতমত হইল, তারপর গলায় একটু জোর দিয়া বলিল,—'এদেশের এই রেওয়াজ—কেউ কিছু মনে করে না। —আচ্ছা নমস্কার।'

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

গোবিন্দবাবু ও মুকুন্দবাবু দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবুর দুই ছেলে, খগেন ও নগেন। মুকুন্দবাবু নিঃসন্তান।

গোবিন্দবাবু যখন পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করিলেন তখন খগেন ও নগেন সাবালক হইয়াছে, তাহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। খগেন অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে চায়; নগেন ফূর্তিবাজ, সে ফূর্তি করিতে চায়। দু'জনেরই টাকা চাই, খুড়ার হাত-তোলায় থাকিতে তাহারা রাজি নয়।

মুকুন্দবাবু ধার্মিক ও ধীরবুদ্ধি লোক। তিনি ভাইপোদের, বিশেষত ফূর্তিবাজ নগেনকে মনে মনে ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাদের সৎপথে থাকিবার উপদেশ দিলেন, তারপর চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিয়া দিলেন। কলহ মনান্তর কিছু হইতে পাইল না। খগেন ও নগেন নিজ নিজ অংশ লইয়া কলিকাতায় গেল। খগেন শেয়ার বাজারে ঢুকিল, নগেন পঞ্চমকার লইয়া পড়িল। এতদিন যাহারা এক সঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াছে তাহারা তিন ভাগ হইয়া গেল।

কয়েক বছর কাটিল। খগেন একাগ্রমনে ব্যবসা করিতেছে, নগেন অনন্যমনে ফূর্তি করিতেছে। খুড়া মুকুন্দবাবু মাসে একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া ভাইপোদের তত্ত্ব-তল্লাস লন। খগেন মাঝে মাঝে আসিয়া খুড়ার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। নগেন বড় একটা আসে না। নগেনের চেয়ে খগেনের বিষয়বুদ্ধি বেশী। কিন্তু তবু এমনই মানুষের মন যে, ধার্মিক মুকুন্দবাবু মনে মনে উচ্ছৃঙখল নগেনকে বেশী ভালবাসেন।

একদিন মুকুন্দবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সময় হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা দেখিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, মুকুন্দবাবু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বটে।

খগেন নিজের অফিসে কাজ করিতেছিল, খুড়োর এক পত্র পাইল। খামের মধ্যে এক-তা কাগজ, মুকুন্দবাবু স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

আমি আজ ১৮ই জুলাই ১৯২১ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী বকলম খাস।

একই সময়ে কলিকাতার অন্য প্রান্তে নগেন খুড়ার নিকট হইতে একখানি চিঠি ও রেজিষ্ট্রি-করা একটি প্যাকেট পাইল। নগেন তখন সবে ঘুম ভাঙিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতেছিল, চিঠি পড়িয়া দেখিল—

কল্যাণবরেষু,

নগেন, আমার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্বে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে এমন আশা করি না। তোমাকে দূর হইতেই আশীর্বাদ করিতেছি এবং সৎপথে চলিবার উপদেশ দিতেছি। আজ রেজিষ্ট্রি ডাকে তোমার নামে একখানি শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা পাঠাইলাম, বইখানি যত্ন করিয়া পড়িও। মৃত্যুকালে আমি তোমাকে ইহাই দান করিয়া গেলাম।

ইতি আশীর্বাদক—তোমার কাকা শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী।

চিঠি পড়িয়া নগেন মুখ বিকৃতি করিল। বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি বোধ-হয় দাদা পাইবে! আর আমার জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। নগেন রেজিষ্ট্রি প্যাকেটখানা তুলিয়া লইয়া ঘোর অভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিল, তারপর টান মারিয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল।

ভৃত্য আসিয়া প্যাকেট তুলিয়া লইয়া বলিল,—'এটা কি বাবু?'

নগেন মুখ বাঁকাইয়া হাসিল,—'গীতা। নিয়ে যা—যত্ন করে পড়িস।—আর, বীয়ার নিয়ে আয়।'

মাস খানেক পরে মুকুন্দবাবু মারা গেলেন। খগেন যথারীতি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিল এবং উইল প্রুভ করিয়া সম্পত্তি দখল করিয়া বসিল। নগেন কোনও প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিল না। তাহার হাতে এখনও অনেক টাকা, খুড়ার অনুগ্রহ সে চায় না।

তারপর দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। নগেন এখন নিঃস্ব। সম্পত্তি ফুরাইয়া গিয়াছে, বাড়ি বিক্রি হইয়াছে, এমন কি আসবাবপত্র লাটে উঠিয়াছে। বাড়ির নূতন মালিক নোটিশ দিয়াছে, আজ বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

নিরাভরণ বাড়ির মধ্যে নগেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার শেষ নাই। নগেন বুক-ফাটা তৃষ্ণায় ছট্ফট্ করিয়া ফিরিতেছিল। মদ—এক গ্লাস মদ। আজ তাহার এমন অবস্থা যে এক গ্লাস মদ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। কেহ একটা টাকা ধার দিবে না। যে-সব বন্ধু তাহার পয়সায় মদ খাইত তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু—এক গ্লাস মদ না পাইলে তাহার তৃষ্ণা মিটিবে কি করিয়া! কাল কি হইবে তাহা তো কালকের কথা, আজ এক গ্লাস মদ পাওয়া যায় কোথায়? একটা টাকা—আট আনা পয়সা কি কোথাও পাওয়া যায় না?

অশান্ত চামচিকির মত ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—ঘরের একটা উচু তাকের উপর কি যেন রহিয়াছে। নগেন হাত বাড়াইয়া সেটা তাক হইতে পাড়িল। ধূলিধূসর একটা বাদামী কাগজ-মোড়া প্যাকেট। কিসের প্যাকেট নগেন মনে করিতে পারিল না। ধুলা ঝাড়িয়া দেখিল রেজিষ্ট্রি—খোলা হয় নাই—প্রেরকের নাম মুকুন্দলাল গাঙ্গুলী। তখন মনে পড়িয়া গেল—গীতা! মৃত্যুর পূর্বে কাকা পাঠাইয়াছিলেন।

গীতা...গীতা বিক্রয় করিলে কত পয়সা পাওয়া যায়। গীতা কি কেউ কেনে? হয়তো এমন লোকও পৃথিবীতে আছে যাহারা গীতা কিনিয়া পড়ে। নগেন মোড়ক খুলিয়া ফেলিল।

সোনার জলে নাম লেখা কাপড়ের বাঁধাই গীতা—এখনও বেশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কত দাম কে জানে। নগেন প্রথম পাতাটা খুলিল—

একখানা ভাঁজ করা কাগজ রহিয়াছে। নগেন খুলিয়া পড়িল, তাহার খুড়ার হস্তাক্ষর—

আমি আজ ১৯শে জুলাই ১৯২১ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি। পূর্বে যে উইল করিয়াছিলাম তাহা অত্র দ্বারা নাকচ করা হইল। আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্র নাথ ও নগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ি সমান ভাগে পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী, বকলম খাস।

পড়িতে পড়িতে নগেন তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। কাকার সম্পত্তির অর্ধেক, অর্থাৎ অন্তত লাখ খানেক টাকা। হায় হায়, এত দিন সে মোড়কটা খুলিয়া দেখে নাই কেন? যে উইলের জোরে দাদা সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিল সে উইল কাকা নাকচ করিয়াছেন। এই উইলই বলবৎ। আর যাইবে কোথায়। দাদার গলা টিপিয়া সে নিজের ভাগ বাহির করিয়া লইবে।

গীতা মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া নগেন পাগলের মত ছুটিল। আগে সে উকিলের কাছে যাইবে, সেখান হইতে উকিলকে সঙ্গে লইয়া দাদার অফিসে যাইবে—

কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, দ্বারের কাছেই খগেনের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। খগেন হাঁটিয়া আসিয়াছে—তাহার মুখ শুষ্ক, চুল উস্ক-খুস্ক। বারো বছর পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ।

খগেন ব্যাগ্রস্বরে বলিল,—নগেন, তোর কাছে এসেছি, বড় দরকার। কিছু টাকা ধার দিতে পারিস?'

'ধার—!' নগেন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

খগেন বলিল, 'হ্যাঁ। আমার সব গেছে। বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে, গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে—তবু ধার শোধ হয়নি। এখন দশ হাজার টাকা বার করতে না পারলে শেয়ার মার্কেট থেকে নাম কেটে দেবে।'

নগেন হঠাৎ খগেনের ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে লাগিল—'কিন্তু কাকার যে এত টাকা পেয়েছিলি তার কি হল? তার অর্ধেক ভাগ যে আমার। এই দ্যাখ্ উইল—' নগেন খগেনের নাকের কাছে উইল মেলিয়া ধরিল।

খগেন বলিল,—'কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। তুই পারবি না দিতে? দিবি না? দশ হাজার টাকা—'

এবার নগেন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—'দশ হাজার টাকা!—একটা জিনিস আছে—গীতা। আয় দাদা, গীতা বিক্রি করব। একটা টাকা পাওয়া যাবে না? তুই আট আনা নিস, আমি আট আনা নেব। কেমন, হবে তো? হা হা হা—'

সেকালিনী

হলুদপুরের কবিরাজ শ্রীহরিহর শর্মার কন্যা শৈল আমাদের কাহিনীর নায়িকা। কিন্তু আজকাল গল্পের নায়িকাদের যেসব অসমসাহসিক প্রগতিপূর্ণ কার্য্য করিতে দেখা যায় তাহার কিছুই সে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। শৈল নিতান্ত সেকালিনী।

হলুদপুর স্থানটির এক পা সহরে এক পা গ্রামে। তবে সামনের পা সহরের দিকে। গত কয়েক বছরে সে বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নাগরিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এতদূরে অগ্রসর হইয়াছে যে, হলুদপুরে দুটি স্কুল পর্য্যন্ত হইয়াছে—একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। তা'ছাড়া লাইব্রেরী আছে, নাট্য-সমিতি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীহরিহর শর্মাও আছেন।

দু'বছর আগে পর্য্যন্ত হরিহর কবিরাজ হলুদপুরের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন, সারা হলুদপুরের নাড়ী তাঁহার মুঠোর মধ্যে ছিল। মরিতে হইলে হলুদপুরের রোগী হরিহর কবিরাজের হাতে মরিত, বাঁচিতে হইলে তাঁহার হাতেই বাঁচিত। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, মেডিক্যাল কলেজের নূতন পাসকরা এক ডাক্তার তাঁহার পাশের বাড়ীতে আসিয়া প্র্যাক্‌টিস্‌ সুরু করিয়াছে।

হরিহর কবিরাজ একনিষ্ঠ সেকেলে মানুষ। সেকালের সহিত একালীন ভেজাল দিয়া একটা বর্ণসঙ্কর জীবন-প্রণালী গঠন করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; হলুদপুরের দ্রুত অগ্রগতি তিনি প্রসন্নতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রথমটা বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে নিজের গৃহেই সেকালত্বের একটি ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কন্যা শৈল স্কুলে পড়িতে যাইতে পায় নাই; দশ বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। গৃহিণী হৈমবতী শেমিজ ব্লাউজ পরিতেন না। সংসারে সাবানের পাট ছিল না; প্রয়োজন হইলে মেয়েরা ক্ষার খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিবে। বেশী কথা কি, বাড়ীতে পাথুরে কয়লা ঢুকিতে পাইত না, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কাঠ-কয়লা ও ঘুঁটের দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। রাত্রে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিত।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে শৈল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে যে পরিপূর্ণরূপে সেকালিনী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে সে নিপুণা হইয়াছিল, এমন কি কবিরাজ মহাশয়ের পাচনাদি রন্ধনেও

তাহার যথেষ্ট পটুত্ব জন্মিয়াছিল, কিন্তু লেখাপড়ার দিক দিয়া ক অক্ষরটি পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে শেখায় নাই। মাতা হৈমবতী শক্ত মেয়েমানুষ ছিলেন; স্বামীর কঠিন সেকালত্ব সম্বন্ধে মনে মনে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্বামীর ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন। শৈল যখন বড় হইয়া উঠিল তখন তিনি সর্ব্বদা তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন এবং রাত্রে তাহাকে লইয়া এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শৈল শেমিজ বা ব্লাউজ পরিবার অনুমতি পাইল না। কেবল রাঙা পাড় শাড়ী পরিয়াই সে যৌবনে উপনীত হইল।

শৈল মেয়েটি দেখিতে ছোটখাট এবং অত্যন্ত নরম; বস্তুতঃ তাহাকে দেখিলে ঐ নরম শব্দটাই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে—সে সুন্দরী কি চলনসই তাহা লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। চোখের দৃষ্টি, মাথার চুল, লালপেড়ে শাড়ীতে সযত্নে আবৃত দেহটি—সবই যেন নরম তুল্‌তুল করিতেছে। স্বভাবটিও তাই; মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়, নরম হাসিটি কিশলয়-পেলব অধরপ্রান্তে লাগিয়া থাকে। বয়স যদিও পূর্ণ ষোল হইতে চলিল তবু দেখিলে চৌদ্দ বছরেরটি বলিয়া মনে হয়।

তাহার সত্যকার চৌদ্দ বছর বয়স হইতে হরিহর তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ, যতই সেকেলে হউন, আইন ভঙ্গ করায় তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে সুপাত্র যোগাড় হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। হরিহর যে-ধরণের সুপাত্র চান, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বাঙ্গালা দেশে সেরূপ পাত্র একান্ত বিরল। তিনি চান সংস্কৃত শিক্ষা-প্রাপ্ত সুদর্শন অবস্থাপন্ন পালটি ঘরের ছেলে। কার্যকালে দেখা গেল, যদি বর মেলে তো ঘর মেলে না, ঘরবর মেলে তো কোষ্ঠী মেলে না। এইরূপে দেরী হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়া হরিহরের মন হইতে কন্যাদায়ের চিন্তা কিছু দিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিল। কলেজে পাশ করা ছোকরা ডাক্তার অজয় গাঙ্গুলী বাহির হইতে আসিয়া যখন তাঁহার পাশের বাড়ীতেই ডাক্তারী আরম্ভ করিল তখন হরিহর এইরূপ ব্যবহারকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অজয় ছেলেটি অতিশয় বিনয়ী ও বাকপটু। সে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলিল যেন সে হরিহরের অধীনেই আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। হরিহর মনে মনে একটু নরম হইলেও অনুরাগ-বিরাগ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল, হলুদপুরের যেসব লোক এতদিন তাঁহার উপরেই জীবনমরণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল তাহারা অধিকাংশই এই নবীন ডাক্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে,

তখন হরিহরের অন্তঃকরণ তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত পাচনের মতই তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না, অগত্যা তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'পাশের বাড়ীতে বাইরের লোক এসেছে; দক্ষিণ দিকের জানালাগুলো যেন বন্ধ থাকে।'

ফলে বাড়ীর দক্ষিণ দিকের তিনটি জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

দশ বছর বয়সে শৈলর জীবন যখন বাড়ীর চারিটি ঘর ও পাঁচিল ঘেরা উঠানের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে এই জানালাগুলিই ছিল বহির্জগতের সহিত তাহার প্রধান যোগসূত্র। জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস আসে, খোলা মাঠের গন্ধ আসে, পাশের বাড়ীটাও দেখা যায়; একটু তেরছাভাবে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে পথের লোক চলাচল চোখে পড়ে। নির্জন দ্বিপ্রহরে জানালায় দাঁড়াইয়া শৈল ঘরের সহিত বাহিরের ক্ষণিক সংযোগ স্থাপন করিত। আকাশে লাল নীল রঙের ঘুড়ি উড়িতেছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশে তাহাদের সূতাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে; রাস্তা দিয়া বিচালি বোঝাই গরুর গাড়ী নিশ্চিন্ত মন্থরতায় চলিয়া যাইতেছে; পাশের বাড়ীর কার্ণিসে একটা পায়রা গুমরিয়া গুমরিয়া কাহার উদ্দেশে অভিমান ব্যক্ত করিতেছে।—রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সে শয়ন ঘরের জানালাটিতে গিয়া দাঁড়াইত। অন্ধকার ঘর, বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না; শৈল গায়ের কাপড় একটু আলগা করিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইত। বাহিরের অন্ধকার ঝিঁঝিপোকার ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত, গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির পরী-আলো জ্বলিত আর নিভিত; দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিত—

কিন্তু জানালাগুলি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখন শৈল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, তাহার মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল না। রাত্রে শয়নের পূর্বে সে কেবল একবার বন্ধ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইত; পুরাণো জানালার তক্তায় একটা চোখ উঠিয়া গিয়া একটা ফুটা হইয়াছিল, সেই ফুটায় চোখ দিয়া সে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিত, তারপর বিছানায় গিয়া শয়ন করিত। মা কাজকর্ম শেষ করিয়া আসিয়া দেখিতেন শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহোক, হরিহর কবিরাজ প্রতিদ্বন্দ্বি সজ্ঘর্ষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া আবার যথারীতি কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমনে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতি মারাত্মক নয়। বিশেষতঃ একাধিপত্যের সময় তিনি যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আবার কন্যার জন্য পাত্রের সন্ধানে মন দিলেন। শৈলর বয়স তখন চতুর্দ্দশী পার হইয়া পূর্ণিমায় পা দিয়াছে।

কয়েকমাস খোঁজাখুঁজির পর কাছেপিঠে হালুইপুর গ্রামে একটি পাত্র পাওয়া গেল। পাত্র ভালই অর্থাৎ হরিহর যাহা চান তাহার ষোল আনা না

হোক চৌদ্দ আনা বটে। হরিহর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। মেয়ে দেখাদেখির কোনও কথা উঠিল না, কারণ দুই পক্ষই গোঁড়া—ঠিকুজি কোষ্ঠি যখন মিলিয়াছে তখন অন্য কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ পর্বটাও বর যখন বিবাহে করিতে আসিবে তখনই সম্পন্ন হইবে।

আষাঢ়ের শেষের দিকে বিবাহের দিন। উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত, আত্মীয় কুটুম্বেরা এখনও আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন সময় বিবাহের ঠিক সাতদিন আগে একটি ব্যাপার ঘটিল। স্নান করিবার সময় শৈলর হাত পিছলাইয়া জলভরা ঘটি তাহার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর পড়িল। আঙ্গুলটা থেঁতো হইয়া নখ প্রায় উড়িয়া গেল। রক্তারক্তি কাণ্ড!

হরিহর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মাত্র সপ্তাহকাল বাকি, এই সময় মেয়েটা এমন কাণ্ড করিয়া বসিল! সাত দিনের মধ্যে ঘা শুকাইবে বলিয়া ও মনে হয় না। ক্ষতযুক্তা কন্যাকে তিনি পাত্রস্থ করিবেন কি করিয়া?

হরিহর বরপক্ষকে দুর্ঘটনার কথা জানাইলেন এবং বিবাহ কিছুদিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। বরপক্ষ বিরক্ত হইলেন, হয়তো কন্যার সুলক্ষণ সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন। দুইপক্ষে একটু কথা কাটাকাটি হইল। তারপর বরপক্ষ অপ্রসন্নভাবে জানাইলেন যে তেশরা শ্রাবণ একটি বিবাহের দিন আছে, সেই দিনের মধ্যে যদি বিবাহ সম্ভব হয় তবেই তাঁহারা বিবাহ দিবেন নচেৎ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে; যেখানেই হোক শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাত্রের বিবাহ দিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

হরিহর তেশরা তারিখের মধ্যে ঘা সারাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু 'বুড়ির গোপান' প্রভৃতি ডাকাতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ঘা সারিল না। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঘা সারা সহজ কথা নয়; বিশেষতঃ মেয়েরা খালি পায়ে থাকে, চলিতে ফিরিতে পায়ে হোঁচট লাগে, আরোগ্যোন্মুখ ঘা আবার আউরাইয়া উঠে। তেশরা শ্রাবণ তো এমন অবস্থা হইল যে, শৈলকে শয্যা লইতে হইল। আঙ্গুলের ঘা বারবার অতর্কিত আঘাত পাইয়া বিষাইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল।

শৈলর ঘা কিন্তু তবু সারে না, মাঝে মাঝে একটু উন্নতি হয়, আবার বাড়িয়া যায়। সারা শ্রাবণ মাসটাই এইভাবে কাটিল। হরিহর ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। হৈমবতীর মায়ের প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতেছিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'ওগো ঘা তো কিছুতেই সারছে না; শেষে কি মেয়েটা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাবে! একবার ঐ ডাক্তার ছেলেটিকে খবর দিলে হয় না?'

হরিহর অনেকক্ষণ মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলিলেন—'বেশ খবর পাঠাও।'

খবর পাইয়া অজয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল। হরিহর কোনও কথা না বলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন; শৈল দালানের মেঝেয় বসিয়াছিল, নীরবে তাহার পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অজয় শৈলর পায়ের বন্ধন খুলিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিল; শৈল পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

অতটুকু আইবুড়ো মেয়েকে সম্ভ্রম দেখানো অজয়ের অভ্যাস নাই; সে স্থানটি টিপিতে টিপিতে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি খুকি, লাগছে?'

শৈলর মুখ একটু বিবর্ণ হইল; একবার অধর দংশন করিয়া সে তেমনি পাশের দিকে মুখ ফিরিইয়া রহিল, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

অজয় তখন হাইড্রোজেন পেরকসাইড দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিল, তারপর তাহাতে টিঞ্চার আয়োডিন ঢালিতে ঢালিতে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—'এবার জ্বালা করছে তো?''

শৈল এবারও মাথা নাড়িয়া জানাইল —না। তাহার মুখখানি কিন্তু আরও একটু পাংশু দেখাইল।

মলম লাগাইয়া ভাল করিয়া পা ব্যাণ্ডেজ করিয়া অজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিহরকে বলিল,—'তিন দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলবেন, বোধহয় ততদিন শুকিয়ে যাবে। বেশী নড়াচড়া কিন্তু বারণ। খুকি, দৌড়াদৌড়ি কোরো না।'

এবার শৈলর মুখের বিবর্ণতা ভেদ করিয়া একট অরুণাভা দেখা দিল। সে নীরবে একবার অজয়ের দিকে আয়ত দৃষ্টি হানিয়া আবার মাথা হেঁট করিল। অজয়ের হঠাৎ মনে হইল মেয়েটাকে সে যতটা খুকী মনে করিয়াছিল বোধহয় ততটা খুকী নয়। সে একটু অপ্রস্তুত হইল।

বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিহর ট্যাক হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া অজয়কে দিতে গেলেন, অজয় হাত জোড় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল,— 'আমরা দুজনেই ডাক্তার। আপনার কাছ্ থেকে টাকা নিতে পারি না।' দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল—'একটা কথা এতদিন বলবার সাহস হয়নি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।'

হরিহর ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন, অজয় তখন বলিল,—'আমার মা অনেক দিন থেকে অম্বলে ভুগ্‌ছেন। কিন্তু তিনি বিধবা মানুষ, ডাঁক্তারী ওষুধ খেতে চান না; তা ছাড়া আমার ওষুধে কাজও কিছু হচ্ছে না। এখন যদি আপনি ব্যবস্থা করেন।'

হরিহরের মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন অজয় তাঁহাকে ঋণী করিয়া রাখিতে চায় না। বলিলেন,—'বেশ, আজ বিকেলে আমি তোমার বাড়ী যাব।'

বৈকালে অজয়ের মাকে পরীক্ষা করিয়া হরিহর ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন —পাচন, গুলি ও অবলেহ। ঔষধ ব্যবহারের বিধি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, —'এক হপ্তা এই চলুক, আশা করি দোষটা কেটে যাবে।'

তিন দিনের দিন শৈলর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখা গেল ঘা শুকাইয়া গিয়াছে। ওদিকে অজয়ের মা সপ্তাহকাল ঔষধ সেবন করিয়া দিব্য চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম স্বার্থ-সংঘাতের উষ্মা অনেকটা প্রশমিত হইল, হয়তো পরস্পরের প্রতি একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল ; কিন্তু উহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পাইল না। স্বার্থের ঠোকাঠুকি যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, সেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হওয়া বড়ই কঠিন। হরিহর ও অজয়ের সম্পর্ক দেঁতো হাসি ও মিষ্ট কথার পর্যায়ে উঠিয়া আটকাইয়া রহিল।

এদিকে শ্রাবণ মাস ফুরাইয়া ভাদ্র মাস আরম্ভ হইয়াছে। শৈলর শরীরও সারিয়াছে। মাঝে আর দুটি মাস বাকি, অঘ্রাণ মাসে মেয়ের বিয়ে দিতেই হইবে। হরিহর আবার সবেগে তত্ত্ব-তল্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কার্ত্তিক মাসের শেষে একটি পাত্র পাওয়া গেল, হরিহর আর বিলম্ব না করিয়া দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাত্রটি এবার অবশ্য তেমন মনের মত হইল না, হরিহর যাহা চান তাহার আট আনা মাত্র। কিন্তু উপায় কি। মেয়ের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হইতে চলিল, আর বিলম্ব করা চলে না। আবার বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিবাহের সাত দিন আগে, দুপুরবেলা হরিহরের উঠানে প্রকাণ্ড উনানের উপর প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে কোনও একটি রসায়ন তৈয়ার হইতেছিল। এরূপ কবিরাজী ঔষধ নিত্যই বাড়ীতে তৈয়ার হয়। শৈল একলা দাঁড়াইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল। বহু গাজগাছড়া ও গুড়ের মত একটি বস্তু একত্র সিদ্ধ হইয়া বেশ একটি স্বর্ণাভ গাঢ়পদার্থে পরিণত হইয়াছে, বড় বড় বুদ্বুদ উদ্গীর্ণ করিয়া টগ্-বগ্ করিয়া ফুটিতেছে।

উঠানে কেহ কোথাও নাই, শৈল একাকিনী দাঁড়াইয়া হাতা নাড়িতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক হাতা তুলিয়া আবার হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতেছিল কতখানি গাঢ় হইয়াছে। শীতের রৌদ্র তেমন কড়া নয়, কিন্তু আগুনের আঁচে তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। আর নরম ঠোঁটে একটুখানি গোপন মিষ্ট হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

এক হাতা ফুটন্ত পদার্থ তুলিয়া লইয়া শৈল সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইল। কেহ নাই; মায়ের ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি এখন কাঁথা

মুড়ি দিয়া একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। শৈল সুমিষ্ট হাসিতে হাসিতে নিজের বাঁ হাতের কব্জির উপর ফুটন্ত হাতা উপুড় করিয়া দিল।

একটা চাপা চীৎকার—! কিন্তু শৈল চীৎকার করে নাই, চীৎকার আসিল ঘরের ভিতর হইতে। হৈমবতী ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আর্ত্তোক্তিতে শৈলর বোধ হয় হাত কাঁপিয়া গিয়াছিল, সবটা পদার্থ তাহার কব্জিতে না পড়িয়া মাটিতে পড়িল।

আগুনখাকীর মত হৈমবতী আসিয়া মেয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; তাঁহাব বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে শৈল চক্ষু নত করিয়া রহিল। হৈমবতী যে সমস্তই দেখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি সহসা কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, বয়লারে বাষ্পাধিক্য ঘটিলে যেরূপ শব্দ করিয়া বাষ্প বাহির হয় তিনি সেইরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তারপর সহসা শৈলর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শৈলকে খাটে বসাইলেন, একটি তালের পাখা শক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন,—'ইচ্ছে করে পায়ে ঘটি ফেলেছিলি। আবাব আজ হাত পুড়িয়েছিস। হারামজাদি, কি চাস তুই বল।'

শৈল উত্তর না দিয়া মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিল; ক্রুদ্ধা হৈমবতী তাহার পিঠে পাখার এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর মাতা ও কন্যার মধ্যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। আধ-ঘণ্টা পরে হৈমবতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং স্বামীর ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হরিহর অজয়ের বাড়ী গেলেন। অজয় রুগী দেখিতে বাহির হইতেছিল, তাহাকে বলিলেন,—'তুমি একবার শৈলিকে দেখে যেও, সে আবার হাত পুড়িয়ে ফেলেছে।'

অজয় চলিয়া গেল। তখন হরিহর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মাতার সহিত কথা কহিলেন।

ইহার পর হলুদপুরের রোগীরা লক্ষ্য কবিল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকমের রফা হইয়া গিয়াছে। অজয় বোগীকে বলে—'আপনার রোগ ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি বরং কবিরাজ মশায়কে দেখান।' হরিহর নিজের রোগীকে বলেন,—'তোমার দেখছি চেরা-ফাড়ার ব্যাপার আছে, তুমি বাপু অজয়ের কাছে যাও।'

কথাটা এখনও প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু অজয়ের সহিত শৈলর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘ মাসে বিবাহ। আশা করা যাইতেছে এবার আর কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটিবে না, সেকালিনী মেয়ে শৈলর বিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইবে।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৫২

দুই দিক্

তিন বন্ধুতে রাত্রির আহার শেষ ক'রিয়া বৈঠকখানার ফরাসের উপর গড়াইতেছিলেন। মস্ত ধুনুচীর মত একটা কলিকায় সুগন্ধি খাম্বিরা তামাক বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিতেছিল। যদিও তিন বন্ধুর মধ্যে দুই জন কায়স্থ এবং এক জন ব্রাহ্মণ, তবু একই গড়গড়ায় সকলের ধূমপান চলিতেছিল।

তিন জনেরই বয়স হইয়াছে—চল্লিশের কাছাকাছি। সকলেই কলিকাতার বাসিন্দা। বিনোদ এক জন বড় ডাক্তার—গত দশ বৎসর বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছেন। অতুল ও শরৎ উকীল; অতুল আলিপুরে এবং শরৎ হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করেন। ইঁহারাও স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে বেশ নাম করিয়াছেন। যে যাহার কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাই কাছাকাছি থাকিয়াও সচরাচর দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে না। আজ স্ত্রীর কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে শরৎ দুই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দিনের বেলা আসিবার সুবিধা হয় নাই বলিয়া দুই জনেই সন্ধ্যার পর অবসরমত আসিয়া জুটিয়াছেন।

নানারকম কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা অজ্ঞাতসারে উঠিয়া পড়িয়াছিল। অতুল তাকিয়ার উপর কনুইটা ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া মুদ্রিত-নেত্রে গড়গড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়া বলিলেন,—'যতই এই পেশার ভেতর ঢুকছি, ততই যেন মনে হচ্ছে, দয়া মায়া ধর্ম্ম—এ সব পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। শুধু কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিড়ি। বেশী দিন এ পথে থাকলে বোধ হয় অন্যায় ন্যায়ের প্রভেদটাও মন থেকে মুছে যায়। খালি কি ক'রে মকদ্দমা জিতব, সেই চিন্তাই সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে।'

শরৎ ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—"তা ঠিক, আদালতে মনুষ্য-প্রকৃতির মন্দ দিক্‌টাই বেশ চোখে পড়ে। ভাল যে থাকতে পারে, এ বিশ্বাসটা ভালর অসাক্ষাতে কমজোর হয়ে আসে। মনে হয় ঠগ বাছতে বুঝি গাঁ উজোড় হয়ে যাবে।"

অতুল বলিলেন, "শুধু মনে হওয়া নয়, সত্যিই তাই। তোমাদের কি ধারণা জানি না, আমার ত বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ব'লে যে একটা সদ্‌গুণের কথা কাব্যে-উপন্যাসে পড়া যায়, সেটা পৃথিবী থেকে বেবাক্ লুপ্ত হ'য়ে গেছে—'

বিনোদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা সব বেজায় সিনিক হ'য়ে পড়েছ, ওটা ঠিক নয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো ভাল নয়, তাতে নিজেরই বেশী লোকসান।"

অতুল বলিলেন, "লাভ-লোকসান বুঝি না ভাই—যা দেখেছি, তাই বল্লুম। কৃতজ্ঞতা পাই না ব'লে আজকাল আর রাগও হয় না। ম্যামথ হাতীর জাত ধ্বংস হ'য়ে গেছে ব'লে যেমন শোক করা বৃথা, এও তাই। সত্যটাকে সহজ ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া মাত্র—"

শরৎ হঠাৎ বলিলেন, "একটা গল্প মনে পড়ল। এমন ত কতবারই হয়েছে, যার উপকার করেছি, সে জবাবে বেশ একটু খোঁচা দিয়ে গেছে। কিন্তু এই ঘটনাটা কি জানি কেন প্রাণের মধ্যে বিঁধে আছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মাঝে আমার চরিত্র খারাপ হয়েছিল, জানো বোধ হয়?"

অতুল বলিলেন "হুঁ, শুনেছিলাম বটে। কে যেন বল্লে—আজকাল শরৎ বাবু যে খুব উড়ছেন। আমি বল্লুম, আজকাল ত ওড়ারই যুগ, শরৎ অন্যায় কি করেছে? তোমার পয়সা থাকে, তুমিও ওড়ো।"

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাণেও এসেছিল কথাটা। নাম ক'রব না, কিন্তু এমন পরিপাটী বর্ণনাটি দিলে যে, বিশ্বাস না করা কঠিন। নেহাত আমি বলেই—"

শরৎ বলিলেন, "তোমরা দু'জন আর আমার স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় এমন আর কেউ নেই যে কথাটা ধ্রুবজ্ঞান করে নি; এমন কি, অনেক পেশাদার ইয়ারও ফুর্ত্তির লোভে আমার দলে ভিড়ে যাবার মতলবে ছিল। ভাবলে, একটা শাঁসালো নতুন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছি।"

অতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হয়েছিল কি?"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এক জনের উপকার করেছিলুম। ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ—শুনে হয় ত হাসবে।

"অতুল, তুমি ত নিতাইকে চেন। আলিপুর বারে প্র্যাক্‌টিস করে—জুনিয়ার উকীল। নেহাৎ জুনিয়ারও বলা চলে না, বছর দশবারো ধ'রে প্র্যাক্‌টিস করছে। নিতাই আমার দূরসম্পর্কে আত্মীয় হয়।

"নিতাইদের অবস্থা আগে ভালই ছিল—তার বাপ মোটা মাইনের চাকরী করতেন। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর থেকেই ওদের দৈন্যের দশা ধরল। সংসারে উপার্জ্জনক্ষম লোকের মধ্যে ঐ এক নিতাই—সে সবে ওকালতীতে ঢুকেছে। কাজেই আর্থিক অবস্থাটা যে কি রকম দাঁড়াল, তা না বল্লেও বুঝতে পারছ।

"আত্মীয়তা থাকলেও ওদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল না, কৃচিৎ কখনো বিয়ে-পৈতেয় দেখাশুনো হ'ত এই পর্য্যন্ত। বছর তিনেক আগে আমার বোন শান্তার ছেলের অন্নপ্রাশনে শালকেয় গিয়েছিলুম, সেখানে নিতাইএর সঙ্গে দেখা হ'ল। অনেক দিন দেখি নি, হঠাৎ দেখে যেন চম্‌কে উঠলুম।

নিতাইএর মুখে দারিদ্র্যের একটা ছাপ প'ড়ে গেছে। ছোকরা দেখতে বেশ সুপুরুষ, রং ফরসা—কিন্তু দারুণ অর্থের অনটন যেন তার মুখময় কাল আঁচড় টেনে দিয়েছে। চোখে সর্ব্বদাই একটা ত্রস্ত সঙ্কোচের ভাব—লজ্জাকর কোনও কথা যেন লোকের কাছ থেকে লুকোতে চায়।

আমাকে এসে প্রণাম করলে। জিজ্ঞেস করলুম—"কি রে, কেমন আছিস?' বল্লে—'ভাল আছি।' আমি বল্লুম—'ওকালতী চলছে কেমন—' সে চুপ করে রইল।

"মনে বড় অনুশোচনা হ'ল। সম্পর্ক যতই দূর হ'ক, নিতাই আমার আত্মীয় ত বটে। চেষ্টা করলে তার কিছু উপকার কি করতে পারতুম না? এই ছেলেটা সংসারযুদ্ধে অভিমন্যুর মত একলা লড়াই ক'রে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে পড়েছে, আর আমি নিজের কাজে এতই মত্ত যে, তার দিকে একবার ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই?

"মনে মনে ঠিক করলুম, নিতাইএর জন্যে একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু তার আগে কোথায় তার সব চেয়ে বেশী ব্যথা, সেটা জানা দরকার। ফস্ ক'রে উপকার করতে গেলেই ত আর হবে না। মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে যাতে সত্যিকারের সাহায্য হয়, এমন কাজ করা চাই।

"সেখানে আর কেউ ছিল না; কৌশলে নিতাইকে জেরা করতে আরম্ভ করলুম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে না করতে নিতাই তার অভাব-অনটনের সব কথা প্রকাশ ক'রে ফেললে। খুব জোরে ক'রে চেপে রাখতে চেয়েছিল বলেই বোধ হয় হঠাৎ ফেটে বেরিয়ে পড়ল।

"শেষে বল্‌লে—'আর কিছু নয় শরৎ দা—মক্কেলও মাঝে মাঝে আসে, কাজও নেহাৎ মন্দ করি, তা নয়। কিন্তু একটা জিনিষের অভাবে সব যেন নষ্ট হ'য়ে যায়। বই নেই। তুমিই বল, নিজের বই না থাক্‌লে কি ওকালতী করা চলে? প্রত্যেক রুলিংএর জন্যে যদি বার-লাইব্রেরীতে দৌড়ুতে হয়, তা হ'লে ওকালতী করা বিড়ম্বনা নয় কি? যে মক্কেল একবার আসে, আমার অবস্থা দেখে আর দ্বিতীয়বার আসে না। বেশী আর কি বলব তোমাকে, একখানা ভাল সিভিলপ্রসিডিওর যে কিনব, সে ক্ষমতা নেই—এক দমে ৩০।৩৫ ট্যাকা কোত্থেকে খরচ ক'রব? পেটে খেতে হবে ত!'

"আমি বল্লুম—বই পেলেই তুই চালিয়ে নিতে পারবি?"

"উৎসুক হয়ে সে বল্লে—'মনে ত হয় পারব, তবে বলতে পারি না, আমার যা পাথর চাপা কপাল।'

"আমি বল্লুম—'আচ্ছা, কি কি বই তোর চাই, একটা লিষ্ট করে দিস, আমি পাঠিয়ে দেব।'

"তার চোখে জল এসে পড়ল; কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে—'শরৎ দা, এ উপকার যদি তুমি কর—কখনো ভুলব না।"

সে দিন ঐ পর্যন্ত হ'য়ে রইল।

পরদিন নিতাইয়ের কাছ্ থেকে মস্ত এক বইএর তালিকা এসে হাজির। Eastern Law Houseএর দোকানে লিষ্টখানা পাঠিয়ে দিলুম, আর উপদেশ দিয়ে দিলুম, বইগুলো নিতাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিয়ে আমার নামে বিল করতে। প্রায় আটশ' টাকার বিল হ'ল।

"তার পর কাজের ঠেলায় নিতাইয়ের কথা একদম ভুলে গেছি। হঠাৎ দিন পনেরো পরে এক দিন মনে পড়ল, কৈ, নিতাইয়ের কাছ্ থেকে বইগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ ত পাই নি। Easern Law House কে ফোন করলুম —তাঁরা উত্তরে জানালেন যে, বই অনেকদিন আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—নিতাইবাবু তার রসিদ পর্য্যন্ত দিয়েছেন। আধঘণ্টা পরেই দোকানের চাকর এসে নিতাইয়ের রসিদ দেখিয়ে গেল।

ভাবলুম কি হ'ল। নিতাই নিশ্চয়ই চিঠি দিয়েছে—তবে কি চিঠি ডাকে আসতে মারা গেল? যা হ'ক নিতাই যখন বই পেয়েছে, তখন ও নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালুম না।

"এর মাস দুই পর থেকে নানা রকম কাণাঘুষা বাঁকা-ইসারা আমার কাণে আসতে লাগল। প্রথমটা গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু ক্রমে আন্দোলনের মাত্রাটা এতই বেড়ে উঠল যে, আমার স্ত্রী এক দিন হাসতে হাসতে আমায় বল্লেন—হ্যাঁ গো, এ সব কি শুনছি—তুমি নাকি বুড়ো বয়সে বাগানবাড়ী যেতে আরম্ভ করেছ?'

"—তুমি কোত্থেকে শুনলে?

'আজ সন্ধ্যেবেলা হীরালাল বাবুর স্ত্রী বেড়াতে এসেছিলেন; কত সহানুভূতি জানিয়ে গেলেন।'

"স্থির করলুম, আর উপেক্ষা করা নয়, কোথা থেকে এই কুৎসার উৎপত্তি তার সন্ধান নিতে হবে। মনে মনে ভারি একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করতে লাগলুম। আমি ত কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, জ্ঞানতঃ কারুর ইষ্ট বৈ অনিষ্ট করি নি, তবে আমার নামে এই সব মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে লোকের লাভ কি?

"পরদিন বিকেলবেলা ঘটনাচক্রে নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। সেই শালকেয় শাস্তার বাড়ীর পর আর তাকে দেখি নি। ফুট্পাথ দিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে সামনে দেখে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তার পর আমি কোন কথা বলবার আগেই হঠাৎ পিছু ফিরে যেন আমার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

"কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। বুকের ভেতরটা যেন বিষিয়ে উঠল। বাড়ী ফিরে এলুম।

"কি মজা দেখ! যতদিন নিতাইয়ের কোন উপকার করি নি, তত দিন সে আমার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন কথাই বলে নি, আমার সম্বন্ধে উদাসীন নির্লিপ্ত ছিল, কিন্তু যেই আমি তার এতটুকু উপকার করেছি, অমনি সে আমার নামে কলঙ্ক রটাতে সুরু করেছে।

"সে যাক্। নিতাই যে এ কাজ করেছে, তাতে আর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তবু সাক্ষাৎ প্রমাণ না নিয়ে শুধু তার ডিমিনারের ওপর নির্ভর ক'রে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। আমি রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম।

"জানতে পারলুম, এই রটনা সম্বন্ধে এক জন ছোকরা-উকীলের উৎসাহ সব চেয়ে বেশী—তার নাম কেশব মিত্তির। কেশবকে এক দিন বারলাইব্রেরীতে ধরলুম। আরো অনেকেই সেখানে ছিল, আমি বল্লুম—কি হে, কাজটা ভাল হচ্ছে? ওকালতী করতে ঢুকেছ, পেনাল কোডের শেষের পাতা কটা কি উল্টে দেখ নি?

"কেশব ফ্যাকাশে মুখ করে বল্লে,—কি......কি বলছেন?'

"আমি বল্লুম,—বলছি আমার নামে যে কুৎসা ক'রে বেড়াচ্ছ, এর পরিণাম কি হ'তে পারে, তা কি ভেবে দেখ নি?

"কেশব রীতিমত ভয় পেয়ে বল্লে, 'তা আমি কি করব? আপনার নিজের আত্মীয় যদি বলে, আমার কি দোষ? আমি ত নিজের চোখে কিছু দেখি নি।'

"আমি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, নিতাই বলেছে?

"সে বল্লে, হ্যাঁ।'

"শুধু শুধু বল্লে, না কোন উপলক্ষ হয়েছিল?'

"কেশব বল্লে, নিতাই আমার বন্ধু। সে দিন তার বাড়ী গিয়ে দেখলুম, আপনি কতকগুলো বই তাকে উপহার দিয়েছেন,। আমার সামনেই বইগুলো দোকান থেকে এলো। নিতাই হেসে বল্লে, 'বইগুলো ঘুষ'। সে না কি আপনাকে কোথায় যেতে দেখেছে, তাই আপনি তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে—

এই ত ব্যাপার! কেশবকে আর কিছু বলতে পারলুম না। আমি শুধু নিতাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলুম।"

অনেকক্ষণ তিন জনেই চুপ করিয়া রহিলেন।

শেষে বিনোদ একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, হুঁ। দুনিয়ার কত রকম বিচিত্র জীবই আছে! আমি একটা ঘটনা বলি শোন। অনেক দিনের কথা, তখন সবে ডাক্তারি আরম্ভ করেছি।

"মেছোবাজার আর বাদুড়বাগানের মোড়ে একটা ছোট ডিস্‌পেন্সারী খুলেছিলুম, নীচের তলায় ডিস্‌পেন্সারী আর উপরে দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি। তখনও বিয়ে করি নি। সমস্ত দুনিয়াটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে।

আমি যেন রূপকথার এক রাজপুত্র, কোথাকার ঘুমনগরীর রাজপ্রাসাদে ঢুকে কোন্ রাজকন্যাকে বুকে তুলে নেব কে জানে ? অজানা ভবিষ্যতের কুয়াসায় ঢাকা একটা মনোহর রহস্য যেন কৌতুকবশেই ধরা দিচ্ছে না! ছলনাময়ী তরুণী প্রিয়ার মত ধরতে গেলেই হেসে পালিয়ে যাচ্ছে। সে এক দিন ছিল, কি বল অতুল—অ্যাঁ ?

"সে যা হোক। দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ডিসপেন্সারীও মন্দ চলছে না, এমন সময় একদিন মাড়োয়ারীদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বেধে গেল। বলা নেই কওয়া নেই, হিন্দু-মুসলমান এক দিন সকালবেলা উঠে পরস্পরের গলা কাটতে সুরু ক'রে দিল।

"সে বীভৎসতার সবিস্তার বর্ণনা করবার কোনও দরকার দেখি না, তোমরাও ত সে সময় কল্‌কাতায় ছিলে, অল্প-বিস্তর দেখেছ। আমার ডিস্‌পেন্সারীর সামনে গোটা তিনেক খুন হ'য়ে গেল, চোখে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কিছু করতে পারলুম না। মুসলমানের পাড়া—আমি হিন্দু; এ রকম অবস্থায় নিজের হিন্দুত্বকে যথাসাধ্য অস্পষ্ট ক'রে ফেলাই একমাত্র নিরাপদ পন্থা।

আমি তবু ডাক্তারখানা খুলে রেখে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে ওষুদ বিষুদ দিয়ে কিছু সাহস দেখিয়েছিলুম। নইলে নিজের কাছে নিজে মুখ দেখাতে পারতুম না।

* * * *

"ঐ পাড়ার একটা গুণ্ডা ছিল, তার নাম নূর মিঞা। পুলিস থেকে আরম্ভ ক'রে পাড়ার কুকুর-বেড়াল পর্য্যন্ত তাকে জানত, এত বড় দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা বোধ হয় কলকাতা-সহরে আর দুটো ছিল না। তার গোটাতিনেক উপপত্নী ছিল—সব কটাই গেরস্তর ঘর থেকে কেড়ে আনা। প্রকাশ্যভাবে কোকেনের ব্যবসা ক'রত কিন্তু কারো সাহস ছিল না যে নূর মিঞাকে ধরিয়ে দেয়।

"দাঙ্গার সময় নূর মিঞা আমার ডাক্তারখানার কাছাকাছি একটা গলির মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকত। রাস্তা নির্জ্জন দেখে কোন হিন্দু একলা সে পথ দিয়ে গেলেই নূর মিঞা দেড় ফুট লম্বা একটা ছুরি নিয়ে নিঃশব্দে এসে তার পিঠে কিম্বা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। ছুরি মেরেই নূর মিঞা অদৃশ্য। তার পর কিছুক্ষণ চেঁচামেচি, হাঁকাহাকি, পুলিসের হুইসল, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর শব্দ। আবার আহত ব্যক্তি স্থানান্তরিত হবার পর—সব চুপচাপ।

"এই রকম গোটাকয়েক অতর্কিত খুন হবার পর ওপথে লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নূর মিঞা তার গলির মধ্যে ওৎ পেতে ব'সে আছে, কিন্তু শিকার আসে না। যখন আসে, তখন লাঠি-তলোয়ার নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে শিকারী সেজে আসে। কাজেই সে সময় নূর মিঞা ও তাঁর স্বধর্ম্মীরা যে, যার কোটরে প্রবেশ করেন। তারা চলে গেল আবার গর্ত্ত থেকে বার হন।

"এমনিভাবে দুটো দিন গেল। দাঙ্গা সমভাবে চলছে, দূর থেকে তার হৈ হৈ সোরগোল শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের পাড়া চুপচাপ। নূর মিঞার হাতে একেবারে কাজ নেই। আমিও সে দিন ভর সন্ধ্যাবেলা ঘরের জানালার কাছে চুপটি ক'রে বসে আছি এমন সময় বাইরে ফুটপাথের ওপর খট্ খট্ শব্দ শুনে গলা বাড়িয়ে দেখি, ভারী নাগরা পায়ে দিয়ে এক পশ্চিমী খোট্টা হন্ হন্ ক'রে আস্‌ছে। তার গায়ে দোলাইএর মত কি জড়ানো, ন্যাড়া মাথার উপর প্রকাণ্ড টিকি—যেন পতাকার মত পতপত করে উড়ছে। দেখেই ত আমার প্রাণ উড়ে গেল। এই রে! এল বুঝি নূর মিঞা তার দেড় ফুট লম্বা ছুরি নিয়ে!

"হলোও তাই। লোকটা আমার বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত আসতে না আসতে নূর মিঞা পিছন থেকে নেকড়ে বাঘের মত এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর মূহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। টিকিধারী খোট্টা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দোলাই-এর ভেতর থেকে দুটো হাত বার করলে—দু'হাতে দুটো ছুরি! নূর মিঞার হাতের ছুরি হাতেই রইল—খোট্টা বিদ্যুৎবেগে একখানা ছোরা তার বুকে আর একখানা তার পেটে বসিয়ে দিলে। তার পর যেমন এসেছিল; সেই ভাবে হাত ঢেকে বেরিয়ে গেল।

"নূর মিঞা ফুটপাথের উপর প'ড়ে গোঙাতে লাগল। তার পর হামাগুড়ি দিয়ে নিজেকে টান্‌তে টান্‌তে আমার দরজা পর্য্যন্ত এসে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল। রক্তে কাদায় দরজার চৌকাঠ মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি আর আমার কম্পাউণ্ডার ধরাধরি ক'রে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম। মনে হচ্ছিল, ঐখানে প'ড়ে ম'রে থাকুক ব্যাটা—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! ঐ কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে প'ড়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক!—কিন্তু ডাক্তার হয়ে সেটা আর কিছুতেই পারলুম না।

"ক্ষত পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, বুকের জখম তত ভয়ানক নয়, কিন্তু পেটের আঘাত সাংঘাতিক। যা হোক্, তখনকার মত ফার্ষ্ট এড্ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করতে যাচ্ছি, নূর মিঞা চোখ চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে,—'ডাগদর সাহেব'!

"তার কাছে যেতেই বল্লে—'জান্ বচা দিজিয়ে আপকো লাখ রূপা দুঙ্গা।'

"বিরক্ত হয়ে বল্লুম—'সেই চেষ্টাই ত করছি রে বাপু! মেডিকেল্ কলেজে যাও—দেখ যদি বাঁচাতে পারে।'

"নূর মিঞা মিনতি ক'রে বল্লে—'মিটিয়া কলেজ মৎ ভেজিয়ে বাবু, হিন্দু ডাগদর লোগ জহর পিলাকে—মার ডালেগা।'

"আমি বিদ্রূপ ক'রে বল্লুম—'তা ত বটেই। মিটিয়া কলেজের ডাক্তাররা সব তোমার মত কি না। কিন্তু আমিই কি তোমাকে জহর খাইয়ে মেরে ফেলে দিতে পারি না? আমিও ত হিন্দু!'

'আপ্ অ্যায়সা কাম নহি' কিজেয়ে গা'—ব'লে নূর মিঞা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এত বেশী রক্তক্ষয় হয়েছিল যে, আর কথা কইবার সামর্থ্য রইল না।

"আমিও ভেবে দেখলুম, নাড়াচাড়া করবার চেষ্টা করলে হয় ত রাস্তাতেই ম'রে যাবে। নিরুপায় হয়ে, হাঁসপাতালে খবর পাঠিয়ে দিয়ে, তাকে নিজের বাড়ীতেই রাখলুম।

"মানুষের মনের মত এমন আশ্চর্য্য জিনিষ বোধ হয় দুনিয়ায় আর নেই। যে লোকটার ওপর আমার ঘৃণা আর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না, যাকে আমি নিজের চোখে তিন-চারটে খুন করতে দেখেছি, তাকেই যে কেন রাত্রি-দিন নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে তুললুম, তা আজও আমি জানি না। আমার মন যখন তাকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছে, তখন আমি তাকে বেদানার রস খাইয়েছি। পূর্ণ বিকারের ঝোঁকে যখন সে 'মারো মারো হিন্দু মারো!' ব'লে চেঁচিয়েছে, আমি তখন তার মাথায় আইস-ব্যাগ ধরেছি। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তোমরা ঘাঁটাঘাঁটি কর, হয় ত এর একটা সদুত্তর দিতে পারবে; স্থূল শরীরটা নিয়ে আমার কারবার, তাই আমার কাছে এ একটা অদ্ভুত প্রহেলিকাই রয়ে গেছে।

"যে দিন তার প্রথম জ্বর ছাড়ল, সে দিন সে বিছানায় উঠে বসে প্রথম কথা কইলে, 'আমাকে একটু কোকেন দিন।'

"তার পর থেকে প্রত্যহ এই কোকেন নিয়ে ঝুলোঝুলি আরম্ভ হ'ল; আমিও দেব না, সেও ছাড়বে না।

"এক দিন সে বল্লে—'ডাগদর সাহেব, দশ হাজার রূপা দুঙ্গা, এক পুরিয়া কোকেন দিজিয়ে।'

"আমি বল্লুম—'তা ত দেব, কিন্তু টাকাটা তোমার দেখি আগে!'

"সে বল্লে—'ইমান কসম, ভেজ্ দুঙ্গা।'

"আমি বল্লুম—'ঢের হয়েছে আর রসিকতা করতে হবে না। জেনে রাখ যে, এক রতি কোকেন একলাখ টাকার বদলেও তোমাকে দেব না।'

"আর এক দিন এমনি কোকেনের জন্যে খাই-খাই করছে, আমি তাকে বল্লুম—'আচ্ছা নূর মিঞা, আমি ত স্বচক্ষে তোমায় তিনটে খুন করতে দেখেছি, এখন যদি তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিই?'

"সে মুখ সিঁটকে বল্লে—'কুছ নহি হোগা। আমার সাবুদ তৈরী আছে। মাঝ থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন।"

"আমি বল্লুম—'কি রকম?'

"সে বল্লে—'দাঙ্গার সময় আমি হাজতে ছিলুম। বিশ্বাস না হয় থানায় গিয়ে দেখে আসতে পারেন, সেখানে আমার টিপ সই পর্য্যন্ত মজুত আছে।'

"লোকটার শয়তানী দেখে নতুন ক'রে অবাক হয়ে গেলুম। নিজের অকাট্য অ্যালিবাই তৈরী ক'রে—আটঘাট বেঁধে তবে দাঙ্গা করতে নেমেছিল।

"তার পর এক দিন, তখনো তার গায়ে ভাল জোর হয় নি, চেহারা প্রেতের মত, আমি তাকে বল্লুম—'তোমার ঘা সেরে গেছে, ইচ্ছে কর ত তুমি এখন যেতে পার।'

"সে কোন কথা না বলে বিছানা থেকে উঠে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় নিচু হয়ে আমাকে একটা সেলাম ক'রে গেল।'

"প্রায় তিন মাস আর নূর মিঞার দেখা নাই। এক দিন আমার কম্পাউণ্ডারকে বল্লুম—"ওহে, সে লোকটা ত আর এলো না।'

"কম্পাউণ্ডারটি তোমাদের মত এক জন সিনিক। সে বল্লে— 'আবার কি করতে আসবে? আপনি কি ভেবেছেন, সে লাখ টাকা নিয়ে আপনাকে দিতে আসবে? মনেও করবেন না। বরং সুবিধে পেলে আপনার গলায় ছুরি বসিয়ে দিতে পারে বটে।'

"কথাটা নেহাত অসঙ্গত মনে হ'ল না। নরহন্তা গুণ্ডাটার প্রাণ বাঁচানর জন্য নতুন ক'রে অনুতাপ হ'তে লাগল।

"সেই দিন দুপুর বেলা একলা ব'সে আছি, হঠাৎ নূর মিঞা এসে হাজির। রুগ্নভাব আর নেই, প্রকাণ্ড ষণ্ডা, লম্বা এক সেলাম ক'রে বল্লে—'হুজুর!'

"আমি বল্লুম—'কি নূর মিঞা, কি মনে ক'রে? তোমার লাখ রূপেয়া নিয়ে এলে নাকি?

"সে লুঙ্গির ভেতর থেকে পুরুষ্ট একটি নোটের তাড়া বার ক'রে বল্লে—মালিক, লাখ-রূপা দেবার আমার ওকাত নেই, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা এনেছি—এই নিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করুন।'

"আমি অবাক হয়ে বল্লুম—"পাঁচ হাজার টাকা কি হবে?'

"সে বল্লে—'হুজুর, এ টাকা আমার নজরানা। ইমানসে বলছি, এর বেশী দেবার এখন আমার ক্ষমতা নেই।'

"আমি হেসে বল্লুম—'নূর মিঞা, তুমি কি ভেবেছ, তোমার টাকার লোভে আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম?'

"নূর মিঞা চুপ করে রইল।

"আমি আবার বল্লুম—'তোমার কোকেন-বেচা মানুষের রক্ত-শোষা টাকা তুমি নিয়ে যাও, ও আমার দরকার নেই। তোমার মত লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে যে পাপ করেছি, ভগবান আমাকে তার শাস্তি দেবেন।'

"টাকা গছাবার জন্য সে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। আমি নিলুম না। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিন্তু আমি অটল হয়ে রইলুম। তখন নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে এক রকম রাগ করেই উঠে চ'লে গেল।

"সাতদিন পরে নূর মিঞা আবার ফিরে এসে বল্লে—'মালিক, আপনি হিন্দু হয়ে জেনে শুনে আমার মত দুষমণের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বেশ, টাকা না হয় নেবেন না। আমাকে আপনার গোলাম করে রাখুন। যা হুকুম করবেন, তাই করব।'

"আমার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া খেলে গেল। বল্লুম, 'যা হুকুম করব, তাই করবে? ঠিক বল্‌ছ?'

"সে বল্লে—'জান কবুল, ইমান কবুল—তাই করব।'

"আমি আবার বল্লুম, 'নূর মিঞা, ঠিক ক'রে ভেবে বল, ঝোঁকের মাথায় দিব্যি গেলে বস না।'

"সে থমকে গিয়ে বল্লে, 'ধর্ম্ম ছাড়তে পারব না। আর যা বলেন, তাই করব। খোদা কসম।'

"আমি বল্লুম—না, ধর্ম্ম তোমাকে ছাড়তে বলব না। কিন্তু এ তার চেয়েও শক্ত কাজ নূর মিঞা।

"সে বল্লে—'তা হোক্, হুকুম করুন।'

"আমি বল্লুম—'বেশ, আমি হুকুম করছি, তোমাকে কোকেন ছাড়তে হবে, কোকেনের ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর গুণ্ডামি ছাড়তে হবে। কেমন পারবে?'

নূর মিঞা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল। অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কি যে ভাবলে, সেই জানে। শেষে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, 'বাবুজী, আমার দুনিয়া আপনি কেড়ে নিলেন। বহুত আচ্ছা, তাই হবে। কোকেন ছাড়বো, গুণ্ডামিও ছাড়বো। কিন্তু এতে আপনার কি নফা হলো, মালিক?'

"আমি তার কাঁধে হাত রেখে বল্লুম—'যদি সত্যই ছাড়তে পার নূর মিঞা, তা হ'লে আমার কি লাভ হ'ল তা আর এক দিন তোমাকে বল্‌ব।'

"গুণ্ডামি নূর মিঞা সহজেই ছেড়ে দিল। কিন্তু কোকেন ছাড়া নিয়ে যে কি কাণ্ড করতে লাগলো, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রথম প্রথম সন্ধ্যা বেলা এসে আমার পায়ে মাথা কুট্‌তে আরম্ভ করলে। কোকেনের ক্ষুধা যে কি পৈশাচিক ক্ষুধা, তা যে কোকেন খায় নি তাকে বোঝান যায় না। প্রত্যহ আমার পায়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বল্‌ত, 'মালিক, একবার হুকুম দাও, একটিবার। ছুঁচের আগায় যতটুক ওঠে, ততটুক খাব, বেশী নয়।'

"এক এক সময় আমারই মায়া হ'ত; জোর ক'রে নিজেকে শক্ত ক'রে রাখতুম

"কিন্তু আশ্চর্য্য মনের বল ঐ গুণ্ডার। আর কেউ হ'লে কোন্‌কালে প্রতিজ্ঞা উড়িয়ে দিয়ে ব'সে থাকত। নূর মিঞা বুলডগের মত প্রতিজ্ঞা কাম্‌ড়ে পড়ে রইলো

"পুরো এক বছর লাগল তার কোকেনের ক্ষুধা জয় করতে। বছরের শেষে এক দিন সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। বল্লে—'মালিক, আজ বুঝেছি, কেন আমাকে কোকেন ছাড়তে বলেছিলে। তুমি মানুষ নয়, তুমি পীর নবী।'

"নূর মিঞা এখন বিড়ি-তামাকের দোকান করেছে।

"ভোরবেলাতে আমার ডিসপেন্সারীতে কখনো যদি যাও, দেখবে নূর মিঞা সর্ব্বপ্রথম এসে আমাকে সেলাম ক'রে যায়।"

✓ভূতোর চন্দ্রবিন্দু

বিভতি ওরফে ভূতোকে সকলেই গোঁয়ার বলিয়া জানিত। কিন্তু সে যখন বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল তখন দেখা গেল বৌটি তাহার চেয়েও এক কাঠি বাড়া, অর্থাৎ একেবারে কাঠ-গোঁয়ার। কাঠ কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেও বেশী বিলম্ব হয় নাই।

ছোট সহর, সকলেই সকলকে চেনে। ভূতোকে সকলেই চিনিত এবং মনে মনে ভয় করিত। গাঁ্যাটা গোঁটা নিরেট চেহারা; কথাবার্ত্তা বেশী বলিত না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাহার হাত যেমন দরাজ ছিল, তেমনি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে মুখ ফুটিবার আগেই তাহার হাত ছুটিত। বাড়ীতে তাহার এক সাবেক পিসী ছিলেন এবং বাজারে ছিল এক 'কাঠের গোলা', পিসী বাড়ীতে ভাত রাঁধিতেন এবং গোলা হইতে সেই ভাতের সংস্থান হইত। কাঠ কিনিতে আসিয়া যে সব খদ্দের দরদস্তুর করিত তাহাদের প্রায়ই পিঠে চেলা কাঠ খাইয়া ফিরিতে হইত।

ভূতোর সম্পর্কে 'চন্দ্রবিন্দু' নামক একটি শব্দ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। একবার ফুটবল খেলিতে গিয়া ভূতো প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পেটে হাঁটুর গুঁতো মারিয়া তাহাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দিয়াছিল। নেহাৎ খেলা বলিয়াই ভূতোর হাতে দড়ি পড়ে নাই, কিন্তু তদবধি 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' কথাটা সহরে প্রবচন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের নামের সম্মুখে চন্দ্রবিন্দু বসিবার ভয়ে ভূতোকে সহজে কেহ ঘাঁটাইত না।

যাহোক, এই সব নানা কারণে, ভূতো পাড়ার ছোকরা-দলের চাঁই হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিলে খরচের অধিকাংশ সে বহন করিত এবং কাহারও সহিত ঝগড়া হাতাহাতি করিবার প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে সম্মুখে আগাইয়া দিত। ভূতোর অবশ্য কিছুতেই আপত্তিছিলনা; বস্তুতঃ মারামারির গন্ধ পাইলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইত।

ভূতোর বৌয়ের নাম বিবাহের আগে পর্য্যন্ত ছিল ক্ষান্ত, এখন হইয়াছে পুষ্পরাণী। তাহাকে তন্বী শ্যামা শিখর দশনা বলা চলে না, কিন্তু স্বাস্থ্য ও যৌবনের গুণে দেখিতে ভালই বলা যায়। মুখখানি গোল, বড় বড় চোখ, গাল দু'টি উঁচু উঁচু; শরীরও গোলগাল বেঁটে খাটো, দেখিলেবেশ মজবুতবলিয়া বোঝা যায়। বৌকে ভূতোর বেশ পছন্দই হইয়াছিল, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে হঠাৎ দু'জনের মধ্যে ফারখৎ হইয়া গেল। কারণ অতি সামান্য। রাত্রে

শয়ন করিতে গিয়া ভূতো হৃদয়ের উদারতা বশতঃ প্রস্তাব করিয়াছিল যে বধূ খাটের ডান পাশে শয়ন করুক, কারণ, ডান পাশের জানালা দিয়া বাতাস আসে। ক্ষান্ত কিন্তু ডান দিকে শুইতে দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করিয়াছিল। দু' জনেই গোঁয়ার; ভূতো যতই জোর দিয়া হুকুম করিয়াছিল, ক্ষান্ত ততই মাথা নাড়িয়াছিল; ফল কথা, ভূতোর উদারতা সে-দিন সার্থক হয় নাই, ক্ষান্ত শেষ পর্য্যন্ত বাঁ পাশেই শুইয়াছিল। বিপরীত দিকে মাথা করিয়া শুইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, কিন্তু গোঁয়ার বলিয়া কেহই কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভূতোর ইচ্ছা হইয়াছিল, গলা টিপিয়া বৌকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দেয়, কিন্তু স্ত্রীজাতির গায়ে হাত তোলা অভ্যাস ছিল না বলিয়া তাহা পারে নাই, কেবল মনে মনে তর্জন গর্জ্জন করিয়াছিল। সকালে উঠিয়াই সে পাশের ঘরে নিজের পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পিসী সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় থাকিতেন না, বিশেষতঃ চন্দ্রবিন্দু হইবার ভয় তাঁহারও ছিল, তাই তিনি দেখিয়া-শুনিয়াও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তাহার পর ছয় সাত মাস কাটিয়াছে কিন্তু ভূতোর পারিবারিক পরিস্থিতি পূর্ব্ববৎ আছে।

ক্ষান্তর মুখ দেখিয়া তাহার মনের কথা ধরা যায় না। সে কান্নাকাটি করে নাই, বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই; বরঞ্চ ভূতোর সংসারটি পিসীর হাত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। ভূতোর জীবনযাত্রা সেজন্য কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সে সকালবেলা চা খাইয়া গোলায় চলিয়া যাইত, দুপুর বেলা আসিয়া স্নানাহার করিয়া খানিক নিদ্রা দিত, তারপর আবার গোলায় যাইত। রাত্রে ফিরিয়া আহার করিয়া পুনরায় নিদ্রা দিত। ক্ষান্ত নামক একটি মানুষ যে বাড়ীতে আছে তাহা সে লক্ষ্যই করিত না। ক্ষান্তও বিশেষ করিয়া নিজেকে ভূতোর লক্ষ্যবস্তু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত না।

ভূতোর বিবাহ-ব্যাপারটা যে ভাল উৎরায় নাই, এ কথা তাহার দলের সকলেই অনুমান করিয়াছিল এবং মনে মনে খুসী হইয়াছিল। সকলের মনেই ভয় ছিল, বিবাহের পর বৌয়ের খপ্পরে পড়িয়া ভূতো দলাদলি ছাড়িয়া দিবে—এমন তো কতই দেখা যায়। পুরুষের বহির্ম্মুখী মন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পাইয়া অন্তর্ম্মুখী হয়। কিন্তু দেখা গেল ভূতো নির্ব্বিকার; বরং তাহার দাঙ্গা করিবার স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। এক দিন সে এক শ্বাদন্ত কাষ্ঠ-ক্রেতার মুখে ঘুষি মারিয়া তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল; কিন্তু ক্রেতার দাঁতেও বিষ ছিল, ভূতোর হাত কাটিয়া গিয়া বিপর্য্যয় ফুলিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ, ফোমেণ্ট, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিলেন; কয়েক দিন ভূতোকে বাড়ীতেই আবদ্ধ থাকিতে হইল। ক্ষান্ত তাহার যথারীতি পরিচর্য্যা করিল কিন্তু দু'জনের মধ্যে একটি কথারও বিনিময় হইল না।

এই ভাবে চলিতে লাগিল। ভূতো সারিয়া উঠিয়া আবার গুণ্ডামি আরম্ভ করিল। সে কদাচিৎ বাড়ীতে থাকিলে দলের ছেলেরা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। এক দিন দুপুর বেলা ভূতো ঘুমাইতেছিল, ছেলেরা একেবারে তাহার ঘরে আসয়া উপস্থিত।

—'ভূতোদা, দিন দিন অরাজক হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা কিছু না করলে আর তো পাড়ার মান থাকে না।"

জানা গেল, মাণিক নামক দলের একটি ছেলে এক বিলাতী কুকুরছানা পুষিয়াছিল। কুকুরছানাটিকে সে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কারণ বাঁধিয়া না রাখিলে কুকুরের রোখ কমিয়া যায়। কিন্তু আজ সকালে কুকুর-শাবক দড়ি কাটিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং মুক্তির আনন্দে একেবারে বদ্যিপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বদ্যিপাড়ার নৃশংস ছোঁড়ারা তাহাকে ধরিয়া ল্যাজ ও কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মাণিক প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—'এ কুকুরের কান কাটা নয়, ভূতোদা, আমাদের পাড়ার কান কেটে নিয়েছে ওরা। এর জবাব তুমি যদি না দাও—'

কার্ত্তিক বলিল,—'বদ্যিপাড়ার ছোঁড়াগুলোর বড় বাড় বেড়েছে, ধরাকে সরা দেখছে। সে-দিন থিয়েটার করেছিল, লোকে একটু ভাল বলেছে কি না, অমনি আর মাটিতে পা পড়ছে না ; যেন ভাল থিয়েটার আর কেউ করতে পারে না। তুমি যতক্ষণ ওদের একটাকে ধরে চন্দ্রবিন্দু না ক'রে দিচ্ছ ততক্ষণ ওরা টিট হবে না ভূতোদা।"

ভূতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'হুঁ।' এবং লংক্লথের পাঞ্জাবীটা গলাইয়া লইয়া দলবল সহ বাহির হইয়া গেল। ক্ষান্ত পাশের ঘর হইতে সমস্তই দেখিল, শুনিল, কিন্তু মুখ টিপিয়া রহিল। আপনার মনে জ্বলিতে থাকিল।

এবার ব্যাপার কিছু বেশী দূর গড়াইল। ভূতোর গোলাতেই সাধারণতঃ দলের আড্ডা বসে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকালে ভূতোর বাড়ীতে দল জমিয়াছিল, মহা উৎসাহে বিগত দিনের ঘটনা আলোচনা করিতেছিল ও চা খাইতেছিল; এমন সময় থানার সব-ইন্সপেক্টর পরেশ বাবু দেখা দিলেন। ছেলের দল তাঁহাকে দেখিয়া নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরেশ বাবু খুব খানিকটা উচ্চ হাস্য করিলেন, তার পর উপবেশন করিয়া কহিলেন, 'বিভূতি বাবু, আপনার নামে অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে কিন্তু উড়ো খবর বলে আমরা কান দিইনি। এবার কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ও-পাড়ার রতন থানায় সানা লেখাতে এসেছিল। আপনি কাল তাকে চড় মেরেছিলেন, ফলে সে আর কানে শুনতে পাচ্ছেনা।'

ভূতো বলিল,—'বেশ তো, করুক না মামলা। চড় মারার জন্যে পাঁচ টাকা জরিমানা বৈ তো নয়।'

পরেশবাবু বলিলেন,—'রতন যদি সত্যিই কালা হয়ে যায় তাহলে দু'-বছর ম্যাদ পর্য্যন্ত অসম্ভব নয়।' তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—'যাহোক, আপনি দুষ্টু-বজ্জাত লোক নয়, তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আমি চেপে দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলবেন। নাচাবার লোক দুনিয়ায় অনেক আছে; কিন্তু যে নাচে পায়ে খিল ধরে তারই।'

পরেশ বাবুর উপদেশের ফলেই হোক অথবা উপলক্ষের অভাবেই হোক অতঃপর কিছু দিন ভূতো শান্ত শিষ্ট হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আগাইয়া আসিতেছিল; ভূতোর দল সরস্বতী পূজার সময় থিয়েটার করে, উদ্যোগ-আয়োজন পূরা দমে আরম্ভ হইয়াছিল। রাত্রে ভূতোর গোলায় একটা চালার নীচে মহলার আসর বসে। ভূতোর অবশ্য অভিনয় করিবার সখ নাই, কিন্তু সে অভিনেতাদের চা তামাকের ব্যবস্থা করিতে সারাক্ষণ সেইখানেই থাকে এবং প্রয়োজন হইলে গানের মহলার সঙ্গে একটু আধটু মন্দিরা বাজায়। আর্টের সঙ্গে ভূতোর সম্পর্ক ইহার বেশী নয়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা ধূমধামের সহিত থিয়েটার হইল। অভিনয় কিন্তু শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কাহাকেও বিশেষ আনন্দ দান করিতে পারিল না। দৈব দুর্বিপাকের উপর কাহারও হাত নাই, অভিনয়ের মাঝখানে সীনের দড়ি যদি হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়, হারমোনিয়ামের মধ্যে ইঁদুর ঢোকে এবং কাটা সৈনিক ষ্টেজের মেঝের উপর পিপীলিকার যৌথ আক্রমণে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া 'বাপ রে' বলিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে অভিনয় জমিবে কি করিয়া? শত্রুপক্ষ সদলবলে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাততালি দিল। ভূতোর দলের মনে আর সুখ রহিল না।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মফঃস্বলের সহরে এক রাত্রি থিয়েটার হইলে সাত দিন ধরিয়া তাহার প্রেতকৃত্য চলে। পরদিন দুপুর বেলা বদ্যিপাড়ার কয়েকটা ব্যাদ্ড়া ছেলে ভূতোর গোলার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানা প্রকার টিট্‌কারি কাটিতে লাগিল। ভূতো গোলায় ছিল না, অভ্যাসমত বাড়ী গিয়াছিল; কিন্তু গতরাত্রের অভিনেতাদের মধ্যে কয়েক জন মচ্ছিভঙ্গ ভাবে সেখানে বসিয়াছিল। বাছা বাছা বচনগুলি তাদের কাণে যাইতে লাগিল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

কিন্তু ভূতো নাই, এই দুর্ম্মুখ শিশুপাল গুলাকে শায়েস্তা করিবে কে? কিছু ক্ষণ অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া কার্ত্তিক তাহার অনুজ গণেশকে বলিল,—গণশা, চুপি চুপি গিয়ে ভূতোদাকে খবর দে তো। আজ সব মিঞাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়ে তবে ছাড়ব—'

গণেশের বয়স কম, গায়ে জোরও আছে সে বলিল—'কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি—ওদের ধরে আচ্ছা করে ঠুকে দিলেই তো হয়—'

কার্ত্তিক চোখ পাকাইয়া বলিল,—'পাকামি করিসনি গণশা। যার কম্ম তারে সাজে। ঠুকে দেবার হলে আমরা এতক্ষণ দিতুম না! যা শিগগির ভূতোদা'কে খবর দে—আমরা ততক্ষণ ঘাপটি মেরে আছি। খবর দিয়েই তুই ফিরে আস্‌বি কিন্তু।'

ধমক খাইয়া গণেশ নিঃশব্দে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল। ওদিকে শিশুপালেদের বাক্যবাণ তখন স্তরে স্তরে আরও শাণিত ও মর্ম্মভেদী হইয়া উঠিতেছে।

ভূতোর মনও আজ ভাল ছিল না। আহারাদির পর সে বিছানায় শুইয়াছিল কিন্তু ঘুমায় নাই। এমন সময় গণেশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া—'ভূতোদা, তুমি শিগগির এস, বদ্যিপাড়ার চ্যাংড়ারা এসে গোলার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে—' বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন ভূতোর বুকের ধিক-ধিক আগুন একেবারে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এম্‌নি একটি সুযোগেরই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ সে দেখিয়া লইবে—বদ্যিপাড়ায় চন্দ্রবিন্দুর পল্টন তৈয়ার করিবে!

তড়াক করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সে একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া লইল, তার পর দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষান্ত কখন অলক্ষিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৃশ্যটা এতই অপ্রত্যাশিত যে ভূতো রাগ ভুলিয়া কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল; তার পর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দ্বারের কাছে আসিল। স্বামি স্ত্রীতে ফুলশয্যার পর প্রথম কথা হইল। ভূতো বলিল, 'পথ ছাড়।'

ক্ষান্তর মুখ কঠিন, ডাগর চোখ আরও বড় হইয়াছে; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'না, তুমি যেতে পাবে না।'

নারী জাতির এই অসহ্য স্পর্দ্ধায় ভূতো স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে চাপা গর্জ্জনে বলিল,—'সর বলছি!'

ক্ষান্ত চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল,—'না, সরব না।'

ভূতোর আর সহ্য হইল না, সে রূঢ় ভাবে ক্ষান্তকে হাত দিয়া সরাইয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। ক্ষান্তও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে পরিবর্ত্তে ভূতোকে সবলে এক ঠেলা দিল।

এই ঠেলার জন্য ভূতো যদি প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ কিছুই হইত না, কিন্তু সে ক্ষান্তর শরীরে এতখানি শক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত ঠেলায় বেসামাল ভাবে দু'পা পিছাইয়া গিয়া সে বেবাক ধরাশায়ী

হইল। ক্ষান্ত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তাহার আজ গোঁ চাপিয়াছে ভূতোকে কিছুতেই বাহিরে যাইতে দিবে না। তাই, ভূতো আবার ধড়মড় করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

*　　　*　　　*　　　*

ওদিকে বদ্যিপাড়ার দল দীর্ঘকাল একতরফা তাল ঠুকিয়া শেষে ক্লান্ত ভাবে চলিয়া গেল। গোলার মধ্যে কার্ত্তিকের দল মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। গণেশ অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভূতোর দেখা নাই। শেষে আর বসিয়া থাকা নিরর্থক বুঝিয়া কার্ত্তিক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তিক্ত স্বরে কহিল—'দুত্তোর। ভূতোদা'রই যখন চাড় নেই তখন আমাদের কিসের গরজ। চল বাড়ী যাই।'

কার্ত্তিক ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বাকি তিন জন গেল না, তিন হাঁটু এক করিয়া বসিয়া রহিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর মাণিক বলিল,—'খবর পেয়েও ভূতোদা এলো না—এর মধ্যে কিছু ইয়ে আছে। জানা দরকার।—যাবি ভূতোদা'র বাড়ী?'

তিন জনে ভূতোর বাড়ী গেল। বাড়ী নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। ভূতোর ঘরের দরজা ভিতর হইতে চাপা রহিয়াছে। মাণিক ইতস্তত করিয়া দরজায় একটু চাপ দিল। দরজা একটু ফাঁক হইল।

সেই ফাঁক দিয়া তিন জনে দেখিল, ভূতো মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া বক্ষলীনা ক্ষান্তর মুখে চুম্বন করিতেছে।

লজ্জায় ধিক্কারে তিন জনে দরজা হইতে সরিয়া আসিল। তাহাদের বীর অধিনায়কের যে এমন শোচনীয় অধঃপাত হইবে তাহা তাহারা কল্পনা করিতেও পারে নাই। অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ভূতো এত দিনে নিজেই চন্দ্রবিন্দু হইয়া গিয়াছে।

বাঘিনী

একটা বাঘিনী শিকার করিয়াছিলাম।

আমি শিকারী, অনেকগুলা বাঘ ভালুক মারিয়াছি। কিন্তু এই বাঘিনীটাকে মারিবার পর তাহার সম্বন্ধে যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার মত পুরাণো শিকারীকেও অবাক করিয়া দিয়াছিল। সাধারণ পাঠক হয়তো গল্পটা বিশ্বাস করিবেন না, মনে করিবেন আমি ঈশপের নব সংস্করণ রচনা করিতেছি কিম্বা বাঘিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ-পরিহাস করিবার চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য, আমরা বাঙালী জাতি বাঘ-ভালুক লইয়া তামাসা করিতে ভালবাসি; কাতু-কুতু দিয়া বাঘ মারা কিম্বা ভালুকের দাড়ি কামাইয়া তাহাকে বধ করার গল্প আমাদের অনাবিল আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহাতে নিন্দায়ও কিছু দেখি না। আমি শুধু বলিতে চাই, এ কাহিনীটি সে-জাতীয় নয়। আমি ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং আমার পাঠকগণের মধ্যে বাঘের চরিত্রজ্ঞ প্রবীণ শিকারী যদি কেহ থাকেন তিনিও হয়তো ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে বঙ্গ বিহারের সমতলভূমি যেখানে দেবাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে, সেই পাহাড় জঙ্গল ভরা দুর্গম কঠিন ভূভাগ এখনও মানুষের করায়ত্ত হয় নাই; এখনও সেখানে হরিণ শম্বর চমরী নীলগাই প্রভৃতি জন্তু এবং তাহাদের ভক্ষক বাঘ নেক্ড়ে চিতা হায়না স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে সব উপত্যকা আছে তাহাতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম রচনা করিয়া বাস করিতেছে বটে কিন্তু তাহা যেন নিতান্তই ভয়ে ভয়ে—সসঙ্কোচে। শ্বাপদের অধিকারই এখনও বলবৎ আছে।

শিকারের সন্ধানে একবার ঐদিক পানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। জনপদ বিরল উপল কর্কশ তরাইয়ের সীমান্ত ধরিয়া স্থানে স্থানে ছোট ছোট সরকারী চৌকি আছে, এইরূপ একটি চৌকিতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক বাঘিনী বড় উৎপাত করিতেছে। গ্রামের দুইজন মাতব্বর চৌকিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে বাঘিনীর কাহিনী শুনিলাম।

মাতব্বর দুইজন জাতিতে পাহাড়ী; বেঁটে খাটো, চক্ষুর একটু বঙ্কিমতা আছে, মুখে দাড়ি গোঁফের বাহুল্য নাই। আমি শিকারী শুনিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল। তাহাদের গ্রামে কয়েক বছর ধরিয়া একটা বাঘিনী দারুণ উৎপীড়ন

করিতেছে; কত যে স্ত্রীলোক আর গরু-মেষ মারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঝে তাহার হিংস্র অভিযান কিছুকালের জন্য বন্ধছিল, আবার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। ভয়ে গাঁয়ের মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না। বাঘিনীর বিশেষত্ব এই, সে পুরুষকে বড় একটা আক্রমণ করেনা, কিন্তু সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোক মারে। ফলে মেয়েদের জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, ক্ষেতে কাজকরা প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে।

এই লইয়া গ্রামের লোকেরা বারবার সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে কিন্তু কোনও ফল পায় নাই। সরকার পঞ্চাশ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এখন আমি যদি বাঘিনীটাকে মারিয়া এই করাল বিভীষিকার হাত হইতে গ্রামটিকে উদ্ধার করি তবেই রক্ষা. নচেৎ গ্রামে আর মানুষ থাকিবে না।

ঘাঁটিদার মহাশয়কে প্রশ্ন করায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অনুমতি দিলেন; বাঘিনীটার নিদানকাল যে এতদিন আমার মত একজন জাঁদরেল শিকারীর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল এবং পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার যে একমাত্র আমারই প্রাপ্য এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় দৃঢ়বিশ্বাস জানাইলেন। তাঁহার এত উৎসাহের কারণ কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না। তাঁহার নিজেরও বন্দুক আছে, তবে তিনি নিজেই বাঘিনীকে বধ করেন নাই কেন? আমার মত ধুরন্ধর শিকারীর জন্য প্রতীক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার কি তাঁহার কাছে এতই তুচ্ছ?

যাহোক পরদিন অতি প্রত্যুষে মাতব্বর দুইজনের সঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। গ্রাম মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে; শিকারীর পক্ষে পঁচিশ মাইল হাঁটা কিছুই নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যে ওকু-স্থলে গিয়া পৌঁছিব তাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে আজ রাত্রেই বাঘিনীকে মারিয়া কাল সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারি।

পথের বিস্তারিত বিবরণ আর দির না। দুইদিন পরে ক্ষতবিক্ষত চরণ ও ভাঙা চরচরে শরীর লইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দূরত্ব পঁচিশ মাইল বটে, ঘাঁটিদার মহাশয় মিথ্যা বলেন নাই। কাক-পক্ষীর পক্ষে এ গ্রামে আসা খুবই সহজ; কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্যকে যে এখানে আসিতে হইলে তিনটি উঁচু উঁচু পাহাড়ের পৃষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া কখনও গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে, কদাচিৎ ইঁদুরের গর্ত্তের মত সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে হামাগুড়ি দিয়া আসিতে হয়, একথার উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং কেন যে তিনি পঞ্চাশ টাকার পুরস্কারের সৌভাগ্য নিজে না অর্জ্জন করিয়া উদারভাবে আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা এই পথ অতিক্রম করিবার পর অতি বড় জন্মনিরেটেরও অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

গায়ের ব্যথা মরিতে পুরা একদিন গেল। গ্রামবাসীরা কিন্তু খুবই আদর যত্ন করিল। গ্রামের প্রান্তে একটি খড়ের ঘর পুরাপুরি আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং দধি দুগ্ধ এত সরবরাহ করিল যে তাহার দ্বারা একটা কন্যার বিবাহ সহজেই নিষ্পন্ন হয়। তাছাড়া, ইহারা সজারুর মাংস হইতে এমন উৎকৃষ্ট শিক-কাবাব তৈয়ার করিতে জানে যে তাহার স্বাদ আর ভোলা যায় না এবং ইহাদের চোলাই করা মহুয়ার আরকও অবহেলার বস্তু নয়।

গ্রামের লোকসংখ্যা ছেলেবুড়ো মিলাইয়া প্রায় শ'দেড়েক হইবে। সকলেই পাহাড়ী। তাছাড়া গৃহপালিত গরু মোষ ছাগল আছে। গাঁয়ের চারিপাশে জঙ্গল কাটিয়া চারণভূমি ও গমের ক্ষেত তৈয়ার হইয়াছে। কাছে পিঠে অন্য গ্রাম নাই; সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রামটি দশ মাইল দূরে— এদেশের দশ মাইল: এমনিভাবে পৃথিবীর কলহ-কোলাহল হইতে একান্ত নির্বিবাদে দুর্গম গিরিসঙ্কটের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মনুষ্য গোষ্ঠি বাস করিতেছে। ইহাদের জীবনে মহান্ধসিন্ধুরঘটার ঘণ্টারণৎকার নাই, লব্ধস্তুতি ভূপতির উগ্র অহংকার নাই। কেবল সম্প্রতি একটা বাঘিনী আসিয়া তাহাদের নির্বিঘ্ন নিরস্ত্র জীবনযাত্রাকে শঙ্কা-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে।

পরদিন, দ্বিপ্রহরের মিঠে কড়া রৌদ্রে খোলা জায়গায় বসিয়া বন্দুকটিকে তৈলাক্ত করিতেছিলাম ও গ্রামবাসিদের গল্প শুনিতেছিলাম; তাহারা অনেকগুলি আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। কেবল একটি ছোকরা অদূরে গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে আমার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। পাহাড়ীদের বয়স অনুমান করা সহজ নয়, তবু তাহার বয়স যে কুড়ি-একুশের বেশী নয় তাহা বোঝা যায়। খর্ব দেহ, মুখখানি ভাবলেশহীন; কিন্তু কেন জানিনা তাহার নিষ্পলক চক্ষুদুটি অস্বস্তিকর একাগ্রতায় আমার মুখের উপর স্থির হইয়া ছিল।

গ্রামবাসীদের কথাবার্ত্তায় বাঘিনী সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পাওয়া গেল। বাঘিনীটি অত্যন্ত নির্ভীক, দিনের বেলাতেও গ্রামের আশেপাশে ঘুড়িয়া বেড়ায়, পাহাড়তলীর জলাশয়ের কাছে ওৎ পাতিয়া থাকে। মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া লাঠি-কাটারি-টাঙি লইয়া জল ভরিতে যায়। মেয়েদের কাজ পুরুষদের করিতে হয় এজন্য পুরুষেরা লজ্জিত। আর একটা আশ্চর্য কথা শুনিলাম, বাঘিনী এই গ্রামটিকেই বিশেষভাবে নিজের লক্ষ্যবস্তু করিয়া বাছিয়া লইয়াছে, অন্য কোনও গ্রামের প্রতি তাহার কোনও আক্রোশ নাই।

আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। বাঘের চরিত্রে এরূপ পক্ষপাত দেখা যায় না। প্রথমতঃ মানুষ বাঘের স্বাভাবিব খাদ্য নয়, নেহাৎ দায়ে পড়িয়া উহারা নরভুক হইয়া উঠে। শিকারীরা জানেন, কোনও কারণে বাঘের দাঁত ভাঙিয়া গেলে কিম্বা পায়ে স্থায়ী জখম হইয়া গতিবেগ হ্রাস হইলে তাহারা স্বীয়

ন্যায্য শিকার ধরিতে পারে না, তখন বাধ্য হইয়া নরভুক হইয়া পড়ে। সরল সুস্থ বাঘ কখনও মানুষ খায় না। এই বাঘিনীটা যদি শারীরিক কোনও অসামর্থ্যের জন্যই নরভুক হইয়া থাকে, তবে সে কেবল স্ত্রীলোক ধরিয়া খাইবে কেন? তাছাড়া, বিশ মাইল পরিধির মধ্যে আরও পাঁচখানা গ্রাম আছে, সেগুলি ছাড়িয়া একান্তভাবে এই গ্রামের উপরেই তাহার নজর কেন?

গ্রামের অনেকেই বাঘিনীকে চক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে খোঁড়াইতে দেখে নাই। বাঘিনী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবতী। সে কখনও মদগর্ব্বে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া যায়, কখনও বিদ্যুতের পীতবর্ণ রেখার ন্যায় নিমেষে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে অদৃশ্য হয়। সুতরাং সে যে বার্ধক্যে অথর্ব হইয়া পড়ে নাই, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

প্রশ্ন করিলাম, এটা বাঘিনী—বাঘ নয়—তাহা তোমরা কী করিয়া বুঝিলে? ইহার সদুত্তর কেহ দিতে পারিল না, কিন্তু কয়েকজন তরুণ বয়স্ক লোক ঘাড় ফিরাইয়া বৃক্ষতলস্থ ছোকরার পানে চাহিয়া হাসিল। আমিও চকিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। তাহার মুখের কোনও ভাবান্তর নাই, সে তেমনি একাগ্র নির্নিমেষ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া আছে। সমবয়স্কদের হাসির ইঙ্গিত তাহার কানে পৌঁছুল কি না সন্দেহ।

অপরাহ্ণের দিকে গ্রামবাসিরা একে একে যে যার কাজে চলিয়া গেল, কেবল ছোকরাটি গাছের তলায় পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। স্থান একেবারে শূন্য হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল,—'সাহেব, বাঘিনীকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে কি? উহাকে কোনও উপায়ে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না?"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম,—'তাড়াইয়া দিলে আবার আসিবে। আমি তো চিরকাল এখানে থাকিয়া বাঘ তাড়াইতে পারিব না।'

সে আর কিছু বলিল না, খানিকক্ষণ অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, দেখিতেছি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত তাহা বাঘ-মারার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। পাঠক নিশ্চয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিতেছেন বাঘিনী কৈ? আমার দুর্ভাগ্য, আমি লেখক নই, শিকারী মাত্র। বাঘ শিকারের উদ্যোগ আয়োজনই দীর্ঘ, আসল হত্যাকাণ্ডটা অতি অল্প সময়েই সংঘটিত হয়। তাই বোধ হয় আমার কাহিনীতেও উদ্যোগপর্বটাই লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর নয়, এবার চটপট বাঘিনীকে সংহার করা প্রয়োজন।

মজার কথা এই যে, বাঘিনীকে সংহার করিতে আমাকে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে নিম্নভূমিতে গ্রামের জলাশয়;

প্রথমে সেটি তদারক করিতে গেলাম। দেখিলাম জলের ধারে বড় বড় থাবার দাগ রহিয়াছে—বাঘিনী জল খাইতে আসে। সুতরাং তাহার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই, এইখানেই তাহাকে পাওয়া যাইবে।

জলাশয়টি বেশী বড় নয়; দুই পাশের পাহাড়-ঝরা জল এখানে সঞ্চিত হইয়া একটি কুণ্ড রচনা করিয়াছে। জলাশয়ের একদিকের পাহাড়টা প্রায় খাড়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আমার ভারি সুবিধা হইল, মাচান বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না; সন্ধ্যার পর ঐ পাহাড়ের গায়ে সমতল হইতে পঁচিশ হাত উঁচুতে একটা কুলুঙ্গির মত স্থানে উঠিয়া পাহারা আরম্ভ করিলাম। এখানে বাঘিনী কোনও ক্রমেই আমার নাগাল পাইবে না, অথচ সে জল খাইতে আসিলে আমি তাহাকে সম্মুখেই দেখিতে পাইব। আকাশে প্রায় পূর্ণাকৃতি চাঁদ ছিল. সুতরাং শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত আলো পাওয়া যাইবে।

শেষ রাত্রি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল না, দশটার মধ্যেই বাঘিনী আসিল। আমি জীবনে আটটা বাঘ মারিয়াছি কিন্তু এখনও অতর্কিত বাঘ সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুকের একটা স্পন্দন বাদ পড়িয়া যায়। দেখিলাম, জলাশয়ের ওপারে একটা কাঁটার ঝাড় নড়িয়া উঠিল, তারপরই বাঘিনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হলুদবর্ণ মসৃণ অঙ্গে চাঁদের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে—গতির কি অপূর্ব নির্ভীক সাবলীলতা! সুস্থ সবল বনের বাঘের মত এমন উগ্র ভয়ানক লাবণ্য আর কোনও জন্তুরই নাই।

বাঘিনী ডাহিনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সটান জলাশয়ের কিনারায় আসিয়া চক্‌চক্ করিয়া জলপান করিতে লাগিল। চাঁদ মধ্যগগনে উঠিয়াছে, দেখিবার কোনও অসুবিধা নাই; প্রায় দিনের মতই আলো। আমি নিঃশব্দে বন্দুক তুলিয়া লইলাম। টোটা ভরাই ছিল; লক্ষ্য স্থির করিয়া সন্তর্পণে সেফ্‌টি-ক্যাচ্ টিপিলাম। খুট করিয়া একটু শব্দ হইল। অমনি বাঘিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া টিপিলাম—কড়াৎ! বাঘিনী তীব্র একটা চীৎকার করিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, তারপর মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মিনিট খানেক পরে তাহার ছটফটানি শান্ত হইল।

আমি আরও দশ মিনিট বন্দুক বাগাইয়া কুলুঙ্গিতে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু বাঘিনী আর নড়িল না। তখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া গ্রামে ফিরিলাম। গ্রামের লোকেরা কান পাতিয়া ছিল, নিস্তব্ধ নৈশবাতাসে বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছিল, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে পাকা খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের বাহির হইতে সাহস করিতেছিল না। এখন খবর পাইয়া তাহারা মহানন্দে নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একদল যুবক তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মৃতদেহটা আনিতে ছুটিল। গ্রামের মেয়েরা, যাহারা এতকাল নিজ নিজ ঘরের চৌকাঠ পার হইতে সাহস করিত না, তাহারা দলে দলে বাহিরে আসিয়া কল-কোলাহল করিতে লাগিল।

যুবকেরা বাঘিনীর মৃতদেহটা বাঁশে ঝুলাইয়া যখন লইয়া আসিল তখন আমার কুটীরের সম্মুখে প্রকাণ্ড ধুনী জ্বলিতেছে; গ্রামের লোকেরা পর্বতপ্রমাণ কাঠ জড় করিয়া তাহাতে আগুন দিয়াছে। বাঘিনীর দেহ আগুনের পাশে শোয়াইয়া দিতেই সকলে সেটাকে ঘিরিয়া ধরিল। জীবন্ত অবস্থায় যে জন্তুটা গ্রামের ত্রাসস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মৃতদেহটাকে কেহই সম্ভ্রম দেখাইল না।

অতঃপর প্রায় সারারাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিল। কয়েকটা আস্ত ছাগদেহ আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শূল্য মাংস তৈয়ার হইতে লাগিল। ঘড়া ঘড়া মহুয়ার নির্যাস অতি দ্রুত সজীব আধারে স্থানান্তরিত হইয়া পাহাড়ীদের নৃত্য-গীতানুরাগ অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিল।

গ্রামবাসিদের অপর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা, শূল্য মাংস এবং মহুয়ারস সেবন করিয়া আমি আগুনের পাশেই কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। উৎসবকারিদের ঢোল-খঞ্জনী প্রভৃতির শব্দের মধ্যেও ক্রমশঃ একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আগুনের আতপ্ত প্রসাদে, সার্থকতার নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে এবং উদরস্থ খাদ্যপানীয়ের অলক্ষিত প্রভাবে বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

হঠাৎ এক সময় চট্‌কা ভাঙিয়া দেখি, উৎসবকারিরা কখন চলিয়া গিয়াছে, ধুনীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রকাণ্ড অঙ্গারগোলকে পরিণত হইয়াছে,। হাত ঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি তিনটা। আগুন সত্ত্বেও শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় একটু গা শীত-শীত করিতেছিল, ঘরের ভিতর গিয়া শুইব কি না মনে মনে গবেষণা করিতেছি, চোখ পড়িল মৃত বাঘিনীটার উপর। দেখি, একটা মানুষ বাঘিনীর মুণ্ড কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং অত্যন্ত স্নেহভরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। ভাল করিয়া চক্ষুর জড়তা দূর করিয়া দেখিলাম, সেই ছোকরা! তাহার মুখ আর ভাবহীন নয়, চক্ষু দিয়া নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে; প্রিয়জন বিয়োগের নিঃসংশয় বেদনা তাহার মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এই দৃশ্য একটা উৎকট হাস্যরসাত্মক স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিতাম যদি না ছোকরার সহিত দ্বিপ্রহরের আলাপের কথা স্মরণ থাকিত। আমি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম। ইহার পিছনে একটা গল্প আছে সন্দেহ নাই।

আমি জাগিয়াছি দেখিয়া সে বাঘিনীর মাথা নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল। নিজের অশ্রুচিহ্নিত শোক লুকাইবার চেষ্টা করিল না, ভগ্নস্বরে বলিল,—'ওর সঙ্গে আমার বড় ভালবাসা ছিল।'

বলিলাম,—'গল্পটা গোড়া থেকে বল।'

অতঃপর, সে যে-কাহিনী বলিয়াছিল, তাহাই বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতেছি। তাহার নাম রূপদমন, সম্ভবতঃ রিপুদমনের অপভ্রংশ।

পাঁচ বছর আগে যখন রূপদমনের বয়স ষোল বছর ছিল, তখন সে কাটারি লইয়া বনে কাঠ কাটিতে যাইত। ঐ বয়সের ছেলেরা বনের গাছে উঠিয়া গাছের সরু সরু ডালগুলি কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া আসিবে, পরে সেই ডালগুলি শুকাইলে গ্রামের মেয়েরা গিয়া তাহা তুলিয়া আনিবে, ইহাই তাহাদের কাষ্ঠ আহরণের রীতি।

ছেলেরা দল বাঁধিয়া দুপুর বেলা কাঠ কাটিতে যাইত; তারপর এগাছ ওগাছ করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কখনও বা কাঠ কাটা শেষ হইলে তাহারা একত্র হইয়া বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলিত, তারপর সকলে মিলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। একটা মানুষ-খেকো বাঘ সম্প্রতি গ্রামে উৎপাত করিতেছে ইহা তাহারা জানিত। কিন্তু ও বয়সের ছেলেরা ডানপিটে হয়; বাঘের ভয় তাহাদের ছিল না। শিশুকাল হইতে তাহারা বনে বাঘ দেখিয়াছে, বাঘ কখনও তাহাদের অনিষ্ট করে নাই। বাঘ দেখিলেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; তাহা হইলে বাঘ আর কিছু বলে না, ধীরে ধীরে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ইহাই তাহাদের শিক্ষা।

একদিন লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে রূপদমন একটি ভারি সুন্দর লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। কতকগুলা বড় বড় পাথরের চাঁই এক জায়গায় ঘাড়ে মুণ্ডে হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে গুড়ি মারিয়া ভিতরে ঢোকা যায়। ভিতরে ছোট একটি কুঠুরীর মত স্থান, উপরদিকে কয়েকটা ফোকর আছে কিন্তু তাহাদের চারিপাশে কাঁটার ঝাড় এত ঘন হইয়া জন্মিয়াছে যে, আকাশ দেখা যায় না। এইখানে সবুজ আলোয় ভরা নিভৃত আশ্রয়টিতে রূপদমন লুকাইয়াছিল। সেদিন তাহার খেলার সাথীরা তাহাকে খুজিয়া পায় নাই।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া বসিয়া রূপদমন শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গিরা তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

ঘুম ভাঙিল মুখের উপর ঝাঁঝালো একটা নিশ্বাসের স্পর্শে এবং সেইসঙ্গে কানের কাছে মৃদু গভীর গুরু গুরু শব্দে। রূপদমন একটা পাথরে হেলান দিয়া ঘুমাইয়াছিল, চোখ মেলিয়া দেখিল চোখের সামনেই প্রকাণ্ড বাঘের মাথা। মূঢ়ের মত সে চাহিয়া রহিল। বাঘিনী ঠিক তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে এবং হিংস্র-প্রখর দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার গলা দিয়া একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইতেছে—গরর্ —

বাঘের এতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রূপদমন আর কখনও লাভ করে নাই। সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার শরীরের স্নায়ু পেশী এমন পরিপূর্ণ ভাবে শিথিল হইয়া গেল যে মনে হইল সে আর কোনও কালেই হাত-পা নাড়িতে

পারিবে না। তাহার পেটের ভিতরটা কেবল ক্ষীণভাবে ধুক্‌ধুক্‌ করিতে লাগিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সাড় ফিরিয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বোধহয় একটু নড়িয়াছিল, বিদ্যুৎবেগে বাঘিনী থাবা তুলিল। সেই থাবার একটি থাবড়া খাইলে রূপদমনের মাথাটি বোধকরি পচা হাঁসের ডিমের মত দ্রব হইয়া যাইত; কিন্তু থাবা শূন্যে উদ্যত হইয়াই রহিল, পড়িল না। রূপদমনও সম্মোহিতের মত থাবার পানে তাকাইয়া রহিল।

থাবার কব্জির কাছে পুঁজ-রক্ত মাখানো রহিয়াছে। রূপদমন লক্ষ্য করিল, ক্ষতস্থানের পুঁজরক্তের ভিতর কয়েকটা বড় বড় শলার মত কাঁটা এ এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে রূপদমনের ভয় কাটিয়া গেল; সে বুঝিতে পারিল কেন বাঘিনী থাবা মারিয়া তাহার মাথাটি চূর্ণ করিয়া দেয় নাই—নিজের বেদনার ভয় তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে।

কাহারও গায়ে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে তাহা টানিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। মনস্তত্ত্ববিদেরা একথা জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার শিকারী-জীবনে আমি ইহা অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। কাহারও শরীরে কাঁটা বিঁধিয়া আছে দেখিলেই হাত নিস্‌পিস্‌ করিতে থাকে এবং সেটা টানিয়া বাহির না করা পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি থাকে না।

রূপদমন আস্তে আস্তে বাঘিনীর থাবার দিকে হাত বাড়াইল। বাঘিনী তাহাকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবার তাহার নড়াচড়ায় বিশেষ আপত্তি করিল না। কেবল তাহার গলার গুরগুর শব্দ একটু গাঢ় হইল এবং মুখখানা ব্যাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর দাঁতগুলাকে প্রকট করিয়া দিল।

কিন্তু ক্ষতস্থানে হাত পড়িতেই বাঘিনীর কণ্ঠ হইতে এমন একটি রুদ্র গর্জ্জন বাহির হইল যে মনে হইল বাঘিনী এখনি রূপদমনকে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য। বাঘিনী তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল না; যে থাবাটা চকিতের জন্য সরাইয়া লইয়াছিল তাহা আবার পূর্ববৎ তুলিয়া ধরিয়া রহিল। বাঘিনী মনে মনে কি বুঝিয়াছিল বাঘিনীই জানে কিন্তু আমি এই প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলেটার দুর্জ্জয় সাহস ও অখণ্ড পরমায়ুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

বাঘিনীর গাঁক্‌ শব্দে রূপদমন হাত টানিয়া লইয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে আবার সন্তর্পণে হাত বাড়াইল। প্রথম কাঁটা বাহির করার যন্ত্রণায় বাঘিনী সংযম হারাইয়া রূপদমনকে মুখের এক ঝাপ্‌টায় কামড়াইতে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কামড়ের বদলে তাহার গাল চাটিয়া দিল। কর্‌করে উখার মত জিভের ঘর্ষণে রূপদমনের গাল জ্বালা করিয়া উঠিল কিন্তু পাহাড়ী বালক টুঁ শব্দ করিল না। অতঃপর বাঘিনী যেন নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবার জন্যই রূপদমনের সর্বাঙ্গ চাটিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে রূপদমনও কাঁটাগুলি

একে একে বাহির করিল। কাঁটাগুলি সাধারণ উদ্ভিদ কাঁটা নয়, সজারুর কাঁটা। বাঘিনী বোধ হয় কোনও সময় থাবা মারিয়া সজারু বধ করিতে গয়াছিল, ইহা সেই অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

কাঁটাগুলি সব বাহির হইয়া গেল, বাঘিনী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটু সরিয়া গিয়া গলার মধ্যে গর্‌গর্‌ শব্দ করিতে করিতে ক্ষতস্থান চাটিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, কোটরের আর বড় কিছু দেখা যাইতেছিল না, কেবল বাঘিনীর চোখদুটা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রূপদমন আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া কোটর হইতে বাহিরের দিকে চলিল, বাঘিনী চোখ ঘুরাইয়া দেখিল কিন্তু বাধা দিল না। বাহিরে আসিয়া রূপদমন এক দৌড়ে গ্রামের দিকে রওনা হইল। ছুটিতে ছুটিতে একসময় পিছু ফিরিয়া দেখিল বাঘিনী কোটরের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গলা উঁচু করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল; রূপদমন বুঝিল ঐ কোটরটা বাঘিনীর বাসস্থান, লুকোচুরি খেলিতে গিয়া সে বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল।

সেই রাত্রে রূপদমনের তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর তিনচার দিন রহিল; তারপর সে সারিয়া উঠিল।

দিন দশেক পরে রূপদমন আবার কাঠ কাটিতে গেল। সঙ্গিসাথীদের বাঘিনীর কথা বলিয়াছিল, কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল কেহ করে নাই। কিন্তু বনের ওদিকটাতে আর না যাওয়াই ভাল এবিষয়ে সকলেই একমত হইল। রূপদমনও প্রথম দিন অন্য সকলের সহিত রহিল, ওদিকে গেল না।

দ্বিতীয় দিন বনের ঐ দিকটা তাহাকে টানিতে লাগিল। সে সঙ্গীদের এড়াইয়া ঐ দিকে চলিল। আগুন লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন, যে বিপদের সহিত উত্তেজনা জড়িত আছে তাহার লোভ সে ছাড়িতে পারে না।

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার গতি আপনিই হ্রাস পাইল, পা আর চলে না। তাহার অবস্থা অনেকটা নবীনা অভিসারিকার মত। আর অগ্রসর হইবে, না ফিরিয়া যাইবে তাহাই মনেমনে তোলপাড় করিতেছে এমন সময় পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সর্‌সর্‌ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া সেইদিকে ফিরিয়া দেখিল, কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, বাঘিনী নিজেই আসিতেছে। বাঘিনী আর খোঁড়াইতেছে না, স্বচ্ছন্দ সাবলীল শার্দুল বিক্রীড়িত ভঙ্গীতে তাহার দিকেই আসিতেছে।

রূপদমন কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বাঘিনী ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া লম্বা হইয়া বসিল। চারিচক্ষুর নিষ্পলক বিনিময় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। বাঘিনীর ল্যাজের ডগাটি একটু একটু নড়িতেছে,

রূপদমনের অনুসরণ করিয়া ও-গ্রামে গিয়াছিল এবং ফিরিবার পথেও সবধূ রূপদমনকে লক্ষ্য করিতে করিতে আসিয়াছিল। ইহা অনুমান হইলেও পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে রূপদমন নববধূ লইয়া বাড়ী ফিরিল। গ্রামে পৌঁছিতে আর পোয়াটাক রাস্তা আছে, বাদ্যকরেরা মৃদুমৃদু বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বিকট গর্জন ছাড়িয়া বাঘিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বরযাত্রীদলের দশগজ সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিল। রূপদমন দেখিল বাঘিনীর হলুদবর্ণ দেহখানা আগুনের হল্কার মত জ্বলিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন বিদ্যুতের শিখা বাহির হইতেছে। বাঘিনীর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা সে আগে কখনও দেখে নাই; তাহার পারার মত উজ্জ্বল চোখদুটা একবার রূপদমন ও একবার তাহার বধূর উপর তড়িৎবেগে যাতায়াত করিতেছে। সে আর একবার গর্জন ছাড়িল; মনে হইল, ক্রোধে হিংসায় সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল; বাদ্যকরেরাও নীরব হইয়া ছিল। কিন্তু কেহ ভয় পাইয়া এদিক ওদিক পলাইবার চেষ্টা করে নাই। এসময় দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তাহা তাহারা জানিত। রূপদমন সম্মুখেই ছিল, তাহার একবার ইচ্ছা হইল দল ছাড়িয়া বাঘিনীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বাঘিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল, সে বুঝিল আজ বাঘিনী তাহাকে হাতের কাছে পাইলে মারিয়া ফেলিবে—তাহার সমস্ত ভালবাসা মারাত্মক হিংসায় পরিনত হইয়াছে। রূপদমন পা বাড়াইতে সাহস করিল না। পা না বাড়াইবার আর একটা কারণ ছিল, নববধূ ভয় পাইয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

বাঘিনী সেদিন বোধ হয় তাহাদের ছাড়িত না, দলের মধ্যে হইতেই ঘাড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এই সময় বাধা পড়িল। গাঁয়ের লোকেরা বাজনার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া হল্লা করিতে করিতে বরবধূকে আগাইয়া লইতে আসিয়াছিল। বাঘিনী পিছন দিকে মানুষের কলরব শুনিতে পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; সুযোগ বুঝিয়া বরযাত্রীদলের বাজন্দারেরাও সজোরে বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বাঘিনী আর পারিল না, ব্যর্থ আক্রোশে দুইবার ল্যাজ আছড়াইয়া গরজাইতে গরজাইতে পাশের জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল। যাইবার আগে নবদম্পতির প্রতি যে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল তাহার সরল অর্থ বুঝিতে রূপদমনের কষ্ট হইল না।

পরদিন বাঘিনী বনে কাষ্ঠাহরণরতা একটি স্ত্রীলোককে মারিল। দ্বিতীয় দিন আর একটি। এই ভাবে আরম্ভ হইয়া বাঘিনীর প্রতিহিংসা যেন গ্রামের সমস্ত নারীজাতির উপরেই সংক্রমিত হইল। মেয়েদের ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইল।

এইভাবে দেড় বৎসর কাটিয়াছে। রূপদমনের স্ত্রীকে মারিবার চেষ্টাতেই হয়তো বাঘিনী সম্মুখে যে স্ত্রীলোককে পাইয়াছে তাহাকেই বধ করিয়াছে; কিন্তু তাহার ঈর্ষাবিষাক্ত জিঘাংসা তৃপ্ত হয় নাই। রূপদমনের বিশ্বাস বাঘিনী যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে না মারিয়া ছাড়িত না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া চলিয়াছি।

প্রথম পাহাড়ের ডগায় উঠিয়া পিছু ফিরিয়া তাকাইলাম। নিম্নে উপত্যকার প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে মাধ্যন্দিন রৌদ্র উপভোগ করিতেছে। আর তাহার ভয় নাই, এখন হইতে গ্রামের মেয়েরা নির্ভয়ে বনে কাঠ কুড়াইতে যাইবে, জলাশয়ে জল আনিতে যাইবে। গ্রামের সহজ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে। রূপদমনের বধূ বোধহয় স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথম মন খুলিয়া হাসিবে। কিন্তু রূপদমনের মনের কাঁটা কখনও দূর হইবে না।

এই গ্রামে, নরসমাজ হইতে একান্ত বিজনে, জঙ্গল ও পাহাড়ের আদিম বাতাবরণের মধ্যে, এক স্বভাব-হিংস্র পশুর সহিত একজন মানুষের প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সার্কাসের মাদক-বিমূঢ় জন্তুর সহিত কৌশলী মানুষের লোকদেখানো হৃদ্যতা নয়, সত্যকার অকৃত্রিম ভালবাসা। এবং অকৃত্রিম বলিয়াই বোধহয় শেষে উহা এমন ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল।

অনেকে এ কাহিনী বিশ্বাস করিবেন না। মানি, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এতই কি অসম্ভব? নিজের কথা বলিতে পারি, আমি রূপদমনের গল্প অবিশ্বাস করিতে পারি নাই।

চরিত্র

যাঁহারা গল্প উপন্যাস লেখেন, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। তাঁহাদের নিজেদের চরিত্রের কথা বলিতেছি না, সে বিষয়ে তাঁহারা নিরঙ্কুশ; নেশা ভাঙ পঞ্চমকার সব কিছুই চলিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে চরিত্র সৃষ্টি করিবেন, সেগুলির সঙ্গতি থাকা দরকার, আত্মবিরোধী হইলে চলিবে না। যেমন ধরা যাক, চরিত্রহীন উপন্যাসে উপীনের চরিত্র। উপীন যদি সতীশের পকেট মারিত কিংবা কিরণময়ীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সব মাটি হইয়া যাইত। সমালোচকেরা ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেন, উপীনের চরিত্র অস্বাভাবিক। পাঠক সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট হইতে পারিতেন না।

তাই ভাবিতেছি আমার বাল্যবন্ধু ভবেশের চরিত্রটা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া প্রকাশ করিলে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কি না। বোধহয় হয় না। কিন্তু না হোক, সত্য কথা বলিতে দোষ কি? সাহিত্য না হয় না-ই হইল। আমরা যাহা লিখি সবই কি সাহিত্য হয়?

আমি ও ভবেশ স্কুলের এক ক্লাসে পড়িতাম। ছোট শহরের হাই স্কুল, অনেক রকম ছাত্র তাহাতে পড়িত। উঁচু ক্লাসে এমন দুই চারিজন ছাত্র ছিল যাহারা গোঁফ কামাইয়া স্কুলে আসিত, বছরের পর পর বছর একই ক্লাসে মৌরসী-পাট্টা লইয়া বসিয়া থাকিত। মাষ্টারেরা তাহাদের সমীহ করিয়া চলিতেন। কিন্তু সে যাক।

ভবেশের চেহারা ছিল হাড়-চওড়া পেশীপ্রধান মজবুত গোছের। মুখের আকৃতি গোল কিন্তু মাংসল নয়; ভ্রূ যুগল বয়সের অনুপাতে রোমশ। ভ্রূর নীচে চোখের দৃষ্টি প্রখর; চোয়ালের হাড় চিবুকের কাছে আসিয়া চৌকশ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত ভবেশের বেশী বন্ধুত্বের কারণ বোধহয় এই যে, আমরা দুজনেই স্কুলের ফুটবল টীমে খেলিতাম। তা ছাড়া আর একটা মিল ছিল, দুজনের স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথ ছিল অনেকখানি একই দিকে। গল্প করিতে করিতে দুজনে স্কুল হইতে ফিরিতাম; তাহার পর সে একটা মোড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ির দিকে চলিয়া যাইত, আমি সোজা রাস্তা দিয়া আরও কিছু দূর গিয়া নিজের বাড়িতে পৌঁছিতাম। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে ইহার অধিক প্রয়োজন হয় না।

ভবেশের প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা ছিল। সে যে স্বভাবতই রাগী ছিল তা নয়, কিন্তু একবার রাগিলে তাহার মুখ ফুটিবার আগেই হাত ছুটিত। মৌখিক ঝগড়া সে করিত না, সে করিত মারামারি। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, অন্যায়ভাবে সে কাহাকেও ঠেঙাইত না। তাহার মনে একটা কঠিন ন্যায়নিষ্ঠা ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিলে সে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিত না, মারামারি বাধাইয়া দিত।

এই যুদ্ধ প্রবণতার জন্য শহরে তাহার অখ্যাতির অন্ত ছিল না। কিন্তু সেই অখ্যাতির সঙ্গে খানিকটা অনিচ্ছাদত্ত খাতিরও ছিল। ব্যাদড়া ছেলেরা তাহাকে ভয় করিত, আবার ভাল ছেলেরাও তাহার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশিতে পারিত না। তাই বোধহয় আমি ছাড়া তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেহ ছিল না।

একদিনের ঘটনা বলিতেছি. তাহা হইতে ভবেশের তৎকালিক কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্কুলে টিফিনের ছুটি হইয়াছে, ভবেশ আমাকে আড়ালে লইয়া বলিল,—"আজ জগন্নাথকে ঠুকব।"

জগন্নাথ লম্বা সিড়িঙ্গে গোছের একটা ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ, ক্রমাগত টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়া পরিপক্ক হইয়াছিল। সে মাষ্টারদের নল্‌চে আড়াল দিয়া স্কুলের প্রাঙ্গণেই সিগারেট টানিত এবং সমবয়স্ক কয়েকটা ছেলেব সঙ্গে দল পাকাইয়া চাপা গলায় অশ্লীল গান গাহিত। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিত না, তাহাকে ঠুকিবার কী প্রযোজন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"জগন্নাথকে ঠুকবি কেন?"

ভবেশের মুখ লাল হইয়াই ছিল, এখন তাহার গ্রীবা যেন ফুলিয়া স্থূল হইয়া উঠিল। সে বলিল,--"বেটা মেয়ে স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েরা যখন ছুটির পর স্কুল থেকে বেরোয় তখন তাদের পানে তাকিয়ে হাসে শিস্‌ দেয়—"

প্রশ্ন করিলাম,—"তুই জানলি কি করে?"

ভবেশ বলিল,—"আমাদের পাশের বাড়ির একটি মেয়ে স্কুলে পড়ে, সে তার দিদিকে বলেছে, তার দিদি আমার দিদিকে বলেছে।"

যে সময়ের কথা সে-সময়ের মেয়েদের স্কুলে পড়া এমন সার্বজনিক হয় নাই, যাঁহারা স্কুলে মেয়ে পাঠাইতেন তাঁহারাও মেয়ের নৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে জানিতে পারিলে অনেকেই বদনামের ভয়ে মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিবেন। ইহার একটা বিহিত হওয়া দরকার। তবু দাঙ্গা- হাঙ্গামা না করিয়া যদি উপায় হয় এই উদ্দেশ্যে বলিলাম,—"তা ঠোকবার দরকার কি! আমাদের হেডমাষ্টারের কানে তুলে দিলেই তো হয়—।"

কিন্তু অত বাঁকাচোরা পথে চলিতে ভবেশ অভ্যস্ত নয়, সে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল,—"না, ঠুকবো ব্যাটাকে। আজ ক্লাসের ছুটি হলেই যাব, যদি

দেখি মেয়ে-স্কুলের ধারে কাছে আছে তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন।"

ভবেশ অ' । ক মারামারিতে যোগ দিতে ডাকে নাই, আমি নিজেই বন্ধুত্বের খাতিরে গিয়াছিলাম। জগন্নাথ ভবেশের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, গায়েও জোর বেশী, কিন্তু ভবেশ সেদিন তাহাকে দুর্দম ঠেঙাইয়াছিল, আমিও দুই চারিটা পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত যে করি নাই এমন নয়। জগন্নাথ মার খাইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং আর কখনও স্কুলের মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে নাই।

তাহার পর ভবেশ যতদিন স্কুলে ছিল ততদিন আরও অনেক মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; তাহার চরিত্রের গতি ও প্রবৃত্তি নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়া কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা অনুধাবন করা মনস্তত্ত্বনিপুণ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন নয়। উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল; ভবেশ কলিকাতায় পড়িতে গেল, আমি মফঃস্বলের এক কলেজে ভর্তি হইলাম। ছুটিছাটায় দেখা হইত; কলিকাতায় গিয়া তাহার মনে নারীর মর্যাদা এবং মারামারির উপকারিতা সম্বন্ধে কোনও ভাবান্তর হয় নাই। তারপর যখন আই এ পাশ করিলাম তখন তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার বাবা বদলি হইয়া অন্য জেলায় গেলেন।

প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি চলিল, তাহার পর তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বি এ পরীক্ষার পর কাগজে দেখিলাম ভবেশ পাশ করিয়াছে। অভিনন্দন জানাইয়া চিঠি লিখিব লিখিব করিয়া আর লেখা হইল না।

কয়েক মাস পরে ছাপা চিঠি আসিল—ভবেশের বিবাহ। চিঠির এক কোণে ভবেশ পেন্সিল দিয়া লিখিয়া দিয়াছে—নিশ্চয়ই আসিস।

আমার তখন বিলাতে যাইবার একটা সম্ভাবনা দানা বাঁধিতেছে। তাহার তদ্বির করিবার জন্য কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। এক ঢিলে দুই পাখি মারিলাম, ভবেশের বিবাহে যোগ দিলাম।

ভবেশ আমাকে দেখিয়া খুশী, আমি ভবেশের বৌ দেখিয়া খুশী। খাসা বৌ হইয়াছে, হাস্যমুখী স্বাস্থ্যবতী মেধাবিনী। ভবেশ চুপিচুপি জানাইল দুই পক্ষেই পূর্বরাগ হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির সহিত তাহার গাঢ়ভাবে মেলামেশা এই প্রথম, দেখিলাম ভিতরে ভিতরে সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে।

যা হোক, ভবেশের ভয়ভঙ্গুর দাম্পত্যজীবন আরম্ভ হইল, আমি বিলাত যাত্রা করিলাম।

তিন বছর পরে চাকরি লইয়া দেশে ফিরিলাম।

কলিকাতার কাছেই আমার আস্তানা পড়িয়াছে। প্রথম চাকরি জীবনের উদ্যোগ উপক্রমের পালা শেষ করিয়া এক দিন ভবেশের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। শরীরের একপ্রকার পরিণতি আছে যাহার সহিত অকালপক্ক ফলের তুলনা করা চলে, ভবেশের দেহটা যেন ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছে। বলিলাম,—"কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ নাকি?"

সে হাসিল। হাসিটা কিন্তু তাহার স্বাভাবিক হাসির মত নয়, তাহাতে একটা বক্রতা রহিয়াছে। বলিল,—"শরীর ঠিক আছে। তোর খবর কি বল।"

তাহার বাবা বছর দুই আগে মারা গিয়াছেন, এখন সে অনেক টাকার মালিক। পাঁচ রকম কথাবার্তার মধ্যে এক সময় বলিল,—"তুই শুনিস নি বোধহয়, আমার বৌ মারা গেছে।"

অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম, দেখিলাম তাহার মুখে বেদনা বা শোকের চিহ্নমাত্র নেই। জিজ্ঞাসা করিলাম,
—"কি হয়েছিল?"

"হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল।"

"কদ্দিন হল?"

"বছর খানেক।—এখন আমি স্বাধীন।" বলিয়া দুই বাহু দুইদিকে প্রসারিত করিয়া আড়ামোড়া ভাঙিল।

"ছেলেপুলে?"

"ছেলেপুলে হয়নি। অর্থাৎ হতে দিই নি।"

শুধু চেহারা নয়, তাহার মনের উপরও ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে এই সত্যটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সে ভদ্রলোক ছিল, এখন একেবারে চোয়াড় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভবেশ—সেই ভবেশ কি করিয়া এমন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সে বলিল,—"আমার বাড়িতে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বেশির ভাগ হোটেলেই খাই। চল আজ তোকে হোটেলে খাওয়াব।"

বলিলাম,—"চল্"

"একটু বস্, আমি কাপড় চোপড় বদলে আসি।"

মিনিট কয়েক পরে সে বিলাতী পোষাক পরিয়া আসিল। মোটরে চড়িয়া দুজনে বাহির হইলাম। উচ্চ শ্রেণীর এক সাহেবী হোটেলে গিয়া ভবেশ ডিনার ফরমাশ করিল। প্রথমে কক্‌টেল্ আসিল। ভবেশ এক চুমুকে নিজের পাত্র নিঃশেষ করিয়া আবার কক্‌টেল হুকুম দিল। আমি নিজের পাত্রটি হাতে লইয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। যাহারা মদ খায় তাহাদের প্রতি ভবেশের মনে তীব্র ঘৃণা ছিল। সেই ভবেশ।

আমাদের অদূরে একটি টেবিলে এক বঙ্গ-তরুণী আহারে বসিয়াছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা বা আধুনিকতার নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই তরুণীর বেশ-বাস এতই সংক্ষিপ্ত যে আমার মত বিলাত ফেরতের চক্ষুও লজ্জায় নত হইয়া পড়ে। ভবেশ তাঁহার দিকে নির্লজ্জভাবে চাহিয়া রহিল, যেন চক্ষু দিয়া তাঁহার কমনীয় দেহটি গিলিতে লাগিল; অতিবড় চাষাও বোধকরি ওভাবে স্ত্রীলোকের পানে তাকায় না। তাহার এই অসভ্যতা কিছুক্ষণ নীরবে সহ্য করিয়া হ্রস্বকন্ঠে বলিলাম,—"এই ভবেশ, ও কি হচ্ছে।"

ভবেশ আমার দিকে ক্ষণেকের জন্য চোখ ফিরাইয়া বক্রমুখে হাসিল; বলিল,—"কি আর হবে, যা সবাই করে তাই করছি। তুই যে ভারি সাধুগিরি ফলাচ্ছিস। বলতে চাস কি? বিলেতে গিয়ে ফুর্তি করিস নি?"

"না, করিনি। কিন্তু তোর হল কি ভবেশ। তোর মন তো এমন নোংরা ছিল না।"

"নে নে, আর ন্যাকামি করিস নি। সব মিঞাকে আমি চিনি, সবাই ডুবে ডুবে জল খায়।"

ভাগ্যক্রমে এই সময় ডিনার আসিয়া পড়িল। কোনও মতে আহার শেষ করিয়া বলিলাম,—"এবার আমি উঠব। বাসায় ফিরতে রাত হবে।'

ভবেশ বলিল,—"আরে এখনি কি! এই তো সবে কলির সন্ধ্যে। —কি খাবি বল্—পোর্ট না শেরি?"

"কিছু খাব না ভাই, আমি এবার বাড়ি যাব।"

"ভয় নেই, আমি তোকে মোটরে পৌঁছে দেব।—এক পেগ্ টানবি না? for old times sake?—বেশ তবে চল।"

অনিচ্ছাভরে ভবেশ উঠিল, হ্রস্ববাস তরুণীর প্রতি নির্লজ্জ লোলুপ কটাক্ষপাত করিয়া বাহির আসিল।

মোটরে কিছুক্ষণ চলিবার পর মনে হইল সে অন্য দিকে চলিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় নিয়ে চললি?"

"রেড রোডের দিকে। ডিনারের পর কিছুক্ষণ ওদিকে বেড়াতে বেশ লাগে।" তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু দুষ্টবুদ্ধির আভাস পাইলাম।

আলো ছায়ায় অস্পষ্ট রেড রোড। সেখানে পৌঁছিয়া ভবেশের দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশ পাইল। আমি জানিতাম না যে এই সময় এখানে পণ্যরমণীদের বেসাতি হইয়া থাকে। ভবেশ মোটর থামাইয়া গাড়ি হইতে নামিল, শিস্ দিতে দিতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ছায়াময়ী নারী-মূর্তির আবির্ভাব হইল।

"হ্যালো ডিয়ার।" "হ্যালো ডার্লিং।" "গুড ঈভ্নিং মাই ডিয়ার।"

ভবেশ দুইটি বাছিয়া লইয়া তাহাদের সহিত বাহু শৃঙখলিত করিয়া মোটরের দিকে ফিরিল।

আমি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। বলিলাম,—'ভবেশ, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ। তুমি উচ্ছন্ন যেতে চাও একলা যাও, আমাকে সঙ্গী পাবে না।—চললাম।"

পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে, ভবেশের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। ইতিমধ্যে আমি বিবাহ করিয়াছি, সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে। ভবেশের কথা মনে হইলে বিরক্তি ও ঘৃণায় মন ভরিয়া ওঠে। সে নিজে লম্পট দুশ্চরিত্র হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার ধাতুর মধ্যে কি এই অধঃপতনের বীজ নিহিত ছিল? গুটিপোকা হঠাৎ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি রূপে বাহির হইয়া আসে। মানুষের মধ্যেও কি এই রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন আছে?

কিন্তু ভবেশের রূপান্তরের পালা এখনও শেষ হয় নাই। অকস্মাৎ তাহার নিকট হইতে এক চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে—

ভাই অরুণ, আমি চললাম। কোথায় যাচ্ছি এখনও জানি না। ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে, তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি খরচ করলে টাকা গুলোর সদ্‌গতি হবে। ব্যাঙ্কে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, তমি গিয়ে খবর নিলেই সব ব্যবস্থা হবে। তোমার ভবেশ।

তাহার কিছুদিন পরে ব্যাঙ্ক হইতেও চিঠি আসিল। ব্যাঙ্কে গিয়া জানিতে পারিলাম ভবেশ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, আমি তাহা যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি। আমি অবশ্য সে-টাকা স্পর্শ করি নাই, এখনও তাহা ব্যাঙ্কেই জমা আছে।

কিন্তু ভবেশ কোথায় গেল? এবং কেনই বা গেল? সে কি কোনও দুষ্কৃতি করিয়া ফেরারী হইয়াছে? সন্তর্পণে খোঁজ খবর লইলাম, কিন্তু তাহার নামে ওয়ারেণ্ট আছে এমন কোনও খবর পাওয়া গেল না। অকারণেই সে সব ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

আরও পাঁচ ছয় বছর কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দূরে নর্মদার তীরে এক বটবৃক্ষতলে ভবেশকে দেখিতে পাইলাম। ঘাটের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, ন্যাড়া মাথা ও আলখাল্লা পরা লোকটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করি নাই; তাহার পর কী মনে হইল, ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখি— ভবেশই বটে। দশ বারো বছর দেখি নাই তবু চিনিতে পারিলাম। চেহারা তেমনি আছে, শুধু যেন একটু মোলায়েম হইয়াছে।

"ভবেশ !"

সে সলজ্জভাবে চক্ষু মিটিমিটি করিল।

বলিলাম,—"এ আবার কি নতুন ঢং। সাধু হয়েছ দেখছি।"

সে বলিল,—"সাধু নয় ভাই, ভিখিরি হয়েছি।" তাহার কণ্ঠস্বর কেন জানি না বড় মিষ্ট লাগিল।

"ভিখিরি হয়েছ !"

ভবেশ আবার অপ্রস্তুত ভাবে চক্ষু মিটিমিটি করিল।

পুনশ্চ প্রশ্ন করিলাম,—"ভিখিরি হয়ে কি লাভ হল ?"

সে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল,—"লাভ—লাভের আশায় তো ভিখিরি হইনি। তবে—লাভ হয়েছে। ভিক্ষায় চিত্তশুদ্ধি হয়, অহঙ্কার নাশ হয় —"

"ছাই হয়। এটা তোমার একটা নতুন ধরণের বাঁদরামি।"

সে মৃদু হাসিল,—"তাও হতে পারে, কিন্তু কি করব ভাই, আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করিনি। একদিন কে যেন ঘাড় ধরে আমাকে সংসার থেকে বার করে দিলে। এখন বুঝতে পারছি আমি জীবনে কোনও দিন নিজের ইচ্ছেয় কিছু করিনি, সব প্রকৃতি করিয়েছে। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—"

"ঢের হয়েছে, সংস্কৃত আউড়ে নিজের লজ্জা প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কোরো না। এবার ভাল ছেলের মত গুটিগুটি দেশে ফিরে চল। তোমার টাকা আমি এক পয়সা খরচ করিনি। সংসারে থেকেও ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা যায়।"

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি তখন গাছের একটা শিকড়ের উপর বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বুঝাইলাম। সে তর্ক করিল না। চুপ করিয়া শুনিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি উঠিলাম। "কাল আবার আসব" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিন সকাল বেলা গাছতলায় গিয়া দেখি সে চলিয়া গিয়াছে।

আর তাহার দেখা পাই নাই। কে জানে ইহার পর তাহার অন্য কোনও রূপান্তর ঘটিয়াছে কি না।

৩রা মাঘ, ১৩৬১

ঘড়িদাসের গুপ্তকথা

চল্লিশ বছর কাটিয়া যাইবার পর কোনও গুপ্ত কথারই আর ঝাঁঝ থাকে না, ছিপি-আঁটা বোতলের আরকের মত অলক্ষিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিশেষত গুপ্তকথার স্বত্বাধিকারী যদি সামান্য লোক হয়। আমার তরুণ বয়সের বন্ধু ঘড়িদাস অসামান্য লোক ছিল না; তাই চল্লিশ বছর আগে তাহার গুপ্তকথায় যে বিচিত্র চমৎকারিত্বের স্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা হয়তো বহু পূর্বেই পান্‌সে হইয়া গিয়াছে। সে এখন কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কিনা, কিছুই জানি না। সম্ভবত মরিয়া গিয়াছে; কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স এতদিনে সত্তরের কাছাকাছি হইত। এত বয়স পর্যন্ত কয়জন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকে? সে বিবাহ করে নাই, সন্তান সন্ততির অভাব। তাই ভাবিতেছি, ঘড়িদাসের গুপ্তকথা এখন প্রকাশ করিলে অন্যায় হইবে না।

বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে মধ্যমাকৃতি একটি জেলা-শহরে তখন বাস করিতাম। রাস্তায় মোটর গাড়ির চেয়ে ঘোড়ার গাড়ি বেশি চলত; রাত্রে কেরোসিনের বাতি জ্বলিত। ফ্রয়েডের নাম তখনও ভারতবর্ষে কেহ শোনে নাই।

ঘড়িদাসের আসল নাম হরিদাস। তাহার একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান ছিল, তাই স্বভাবতই সকলে তাহাকে ঘড়িদাস বলিয়া ডাকিত। আমি যদিও ঘড়িদাসের চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোট ছিলাম, তবু তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আমার বয়স তখন ছিল উনিশ-কুড়ি; তাহার কাছে আমি দাবা খেলিতে ও সিগারেট খাইতে শিখিয়াছিলাম।

বাজারের মণিহারী পটির একপাশে ঘড়িদাসের দোকান ছিল। সামনে পিছনে দুটি ঘর। সামনের ঘরে দোকান, পিছনের ঘরে ঘড়িদাস বাস করিত। মনে আছে, তাহার বাসার ভাড়া ছিল সাড়ে চার টাকা। একবার তাহাকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সগর্বে বলিয়াছিল—'হাফ পাষ্ট ফোর।' ঘড়িদাসের বিদ্যা ছিল স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত, কিন্তু সে সুবিধা পাইলেই ইংরেজি বলিত।

ঘড়িদাসের মা-বাপ ছিল না। এক মামা ছিল, কলিকাতায় চাকরি করিত; মাঝে মধ্যে ঘড়িদাসকে চিঠি লিখিত। তাহার বাসায় আত্মীয়স্বজন কাহাকেও কখনও দেখি নাই। সকালবিকাল সে দোকানে একটি দেরাজযুক্ত জলচৌকির সম্মুখে বসিয়া ঘড়ি মেরামত করিত; বাকি সময়টা পিছনের ঘরে শুইয়া কাটাইত। আমার সহিত তাহার আলাপের সূত্র, পরীক্ষার আগে আমার এলার্ম ঘড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার কাছে মেরামত করাইতে লইয়া গিয়াছিলাম।

সে মেরামত করিয়া দিয়াছিল, পয়সা লয় নাই। লোকটিকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। তারপর হইতে দুপুর বেলা অবসর থাকিলে তাহার ঘরে গিয়া আড্ডা দিতাম। লুকাইয়া ধূমপান ও দাবা খেলা চলিত।

একদিন জৈষ্ঠ্যের আম-পাকানো দুপুরবেলা ঘড়িদাসের দোকানে গিয়াছি। দুপুর বেলা যদি কোনও খদ্দের আসে, এইজন্য সদরের দরজা ভেজানো থাকে। আমি তাহার দোকানঘর পার হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; সে তক্তপোষে লম্বা হইয়া একখানা পোষ্টকার্ড পড়িতেছে। আমি বলিলাম—'এ কি ঘড়িদা, তোমাকে চিঠি লিখল কে? প্রেমপত্র নাকি?'

ঘড়িদাস হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিল 'প্রেমপত্রই বটে। মামা কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছে, আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে।'

বলিলাম—'বেশ তো, লাগিয়ে দাও। আমি বরযাত্র যাব।'

ঘড়িদাস বলিল,—'তুই ক্ষেপেছিস! যা আমার চেহারা, বৌ শেষকালে ছাঁদনাতলা থেকে abscond করুক আর কি। ওসবের মধ্যে আমি নেই বাবা।'

বস্তুত ঘড়িদাসের চেহারা মনোমুগ্ধকর নয়। কালো রোগা লম্বা দেহ, হাড় বাহির করা মুখ, নাকটা মুচড়াইয়া একদিকে বাঁকিয়া আছে, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। তাছাড়া তাহার পা দু'টার দৈর্ঘ্যও সমান নয়, তাই সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে। এরূপ স্বামী পাইয়া কোনও মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হইবে সে সম্ভাবনা কম।

ঘড়িদাস চিঠিখানা বালিসের তলায় রাখিয়া বলিল,—'আয়, এক দান খেলা যাক।'

বিছানার উপর দাবার ছক পাতিয়া ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে সে বলিল,—'মেয়েমানুষ ভারি ডেঞ্জারাস্‌, বিয়ে হয়েছে কি পট করে বাচ্চা! আমার মামার সাত মেয়ে তিন ছেলে, মাইনে পায় কুল্‌লে দেড়শো টাকা। মানে গড়পড়তা সাড়ে বার টাকা per head! বাপস্‌! আমি একলা মানুষ, আমারই মাসে ত্রিশ টাকা খরচ!'

সে আমাকে একটা কাঁচি সিগারেট দিল, নিজে একটা ধরাইল। খেলা আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর লক্ষ্য করিলাম, অন্য দিন যেমন পাঁচ-সাত দান দিবার পরই সে আমার টুঁটি টিপিয়া ধরে আজ তাহা পারিতেছে না। মামার চিঠিখানা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে তাহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাৎ হইয়া গেলাম। ঘড়িদাস ঘুঁটিগুলি কৌটার মধ্যে ভরিতে ভরিতে বলিল—'শশা, একটা কুকুরছানা জোগাড় করতে পারিস?'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কুকুরছানা কি হবে?'

সে বলিল,—'পুষব। বেশ একটা তুলতুলে লোমওলা কুকুরছানা। জানিস তো কুকুর হচ্ছে মানুষের best friend.'

আমি বলিলাম,—'কুকুর তুমি পুষো না, ঘড়িদা, ভারি ঘরদোর নোংরা করে। তার চেয়ে পাখী পোষো, কোনও ঝামেলা নেই।'

'পাখী!' ঘড়িদাস চিন্তা করিয়া বলিল, —'মন্দ বলিস নি। টিয়া পাখী। রাধা কেষ্ট পড়বে। কিম্বা এক খাঁচা মুনিয়া পাখী—'

তখন আমার বয়স কম ছিল, ঘড়িদাসের পশুপক্ষী-প্রীতির মর্মার্থ বুঝি নাই।

আর একদিন দুপুরবেলা এমনি খেলিতে বসিয়াছি। সে দিনটা বোধ হয় ঘড়িদাসের জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয় দিন। খেলিতে খেলিতে দু'জনেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম; যে অবস্থায় দাবা-খেলোয়াড় 'কাদের সাপ?' প্রশ্ন করে আমাদের তখন সেই অবস্থা। তাই বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে প্রবেশ করিলেও মন পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। হঠাৎ যখন চমক ভাঙিল তখন ঘাড় তুলিয়া দেখি, একটি যুবতী শয়ন কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দু'জনে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সেকালে পথেঘাটে ভদ্রশ্রেণীর যুবতী চোখে পড়িত না, কদাচিৎ চোখে পড়িলে মনে হইত বুঝি অলৌকিক আবির্ভাব। হৃদয় রসায়িত হইত, কল্পনা জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিত। এই যুবতীটি কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়, শহরের পথে বিপথে বিদ্যুচ্চকের মত তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি। সিভিল সার্জন সুব্রতঘোষালের কন্যা প্রমীলা।

প্রমীলা ঘোষাল সত্যই সুন্দরী ছিল, কিম্বা আমরা অবরুদ্ধ কৌমার্য্যের চক্ষু দিয়া তাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। মনে হয় তাহার গায়ের রঙ ফরসা ছিল, চোখে ছিল প্রগল্ভ চটুলতা; আর সারা গায়ে ছিল ভরা যৌবন। এ ছাড়া তাহার চেহারার সমস্তই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। তাহার একটি ছোট্ট মোটর-গাড়ী ছিল, সেটি নিজে চালাইয়া সে যখন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত তখন মনে হইত যেন একটা রোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই নিজে মোটর গাড়ী চালানোই ছিল তখন এক অপরিমেয় বিস্ময়। তাছাড়া জনশ্রুতি ছিল, সে সাহেবদের ক্লাবে গিয়া বলডান্স করে। সব মিলিয়া প্রমীলা ঘোষাল এক পরম রমণীয় রোমাণ্টিক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্পনা-বিলাসী যুবকেরা ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিত।

এমন যে প্রমীলা ঘোষাল, সে ঘড়িদাসের শয়ন কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা নির্বাক, নিষ্পলক, প্রায় নিস্পন্দ। তারপর বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—'ঘড়িদাস কার নাম?'

ঘড়িদাস সূচীবিদ্ধবৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'আমি—মানে—আমি হরিদাস—'

প্রমীলা তাহার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিল,—'কড়া নেড়ে সাড়া পেলুম না, তাই ভেতরে ঢুকেছি। আপনি ঘড়ি মেরামত করেন ?'

ঘড়িদাস বলিল,—'হ্যাঁ—আমি—হ্যাঁ।'

প্রমীলা বলিল,—'আমার রিস্ট-ওয়াচটা চলছে না, আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন ?'

ঘড়িদাস বলিল,—'রিষ্ট ওয়াচ। হ্যাঁ পারব—নিশ্চয় পারব।'

প্রমীলার কব্জি হইতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিতেছিল, সে তাহা খুলিয়া ছোট্ট একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া ঘড়িদাসের হাতে দিল। ঘড়িদাস নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিল, দম দিয়া দেখিল, তারপর বলিল,—'মেন্-স্প্রিং ভেঙে গেছে।'

প্রমীলা বলিল,—'ও।—তা আপনি মেরামত করতে পারবেন তো ? নৈলে আবার কলকাতা পাঠাতে হবে।'

'না না, আমি পারব।'

'আমার কিন্তু শিগ্‌গির চাই।'

'কাল পরশুর মধ্যে ঘড়ি মেরামত করে আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

প্রমীলা তাহার প্রতি স্মিত কটাক্ষপাত করিল,—'আপনি আমার বাড়ি চেনেন ? ভালই হল, বাড়িতেই পৌঁছে দেবেন। বিল নিয়ে যাবেন, টাকা চুকিয়ে দেব।'

ঘড়িদাস কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। প্রমীলা একটু ঘাড় হেলাইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, তারপর ফিরিয়া বলিল,—'ঘড়িটা দামী, দু'শো টাকা দাম। আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, হারিয়ে টারিয়ে যাবে না তো ?'

'না না, কোনও ভয় নেই—'

'আচ্ছা। কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয় যেন পাই।'

প্রমীলা খুট্ খুট্ জুতার শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, ঘড়িদাস তাহার পিছন পিছন গেল। আমি ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলাম, প্রমীলার মোটর চলিয়া গেল। তারপর ঘড়িদাস ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষের পাশে বসিল। তাহার মুঠির মধ্যে ঘড়িটা ছিল, মুঠি খুলিয়া সম্মোহিতের মত সেটাকে দেখিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—'ঘড়িদা, তোমার খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে দেখছি, প্রমীলা ঘোষালও নাম জানে।'

ঘড়িদাস একবার চোখ তুলিয়া ফিকা হাসিল, তারপর আবার ঘড়ির প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাজিটা শেষ করবে নাকি ?'

'বাজি? ও—না ভাই, আজ থাক, আর একদিন খেলা শেষ করা যাবে।' বলিয়া ঘড়িদাস দোকানঘরে তাহার জলচৌকির সামনে গিয়া বসিল। চৌকির উপর কয়েকটা ঘড়ির অন্ত্রতন্ত্র ছড়ানো ছিল, সেগুলো এক পাশে সরাইয়া প্রমীলার ঘড়ি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিন দুপুরে ঘড়িদাসের কাছে যাই নাই। সন্ধ্যার পর পড়িতে বসিয়াছি, ঘড়িদাস আসিয়া উপস্থিত। মাথার চুল উস্কখুস্ক, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, নাকটা যেন আরও বাঁকিয়া গিয়াছে; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—'ওরে শশা, সর্বনাশ হয়েছে, ঘড়িটা চুরি গেছে।'

'কোন ঘড়ি? প্রমীলা ঘোষালের ঘড়ি?'

'হ্যাঁ। এখন আমি কি করি?'

'চুরি গেল কি করে?'

'দুপুরবেলা কেউ ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি শোবার ঘরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

'পুলিসে খবর দিয়েছ?'

'ও বাবা, পুলিসে খবর দিলে তারা হয়তো আমাকেই ধরে হাজতে পুরবে। সিভিল সার্জনের মেয়ের ঘড়ি।'

'তবে কি করবে?'

'কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তুই বল্ না।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। তখন ঘড়িদাস নিজেই বলিল—'এক উপায় দাম দিয়ে দেওয়া। প্রমীলা বলেছিল ঘড়ির দাম দু'শো টাকা—'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দুশো টাকা তুমি দিতে পারবে?'

'কোথায় পাব দু'শো টাকা? কুড়িয়ে বাড়িয়ে টাকা পঞ্চাশেক হতে পারে।'

'তাহলে উপায়?'

ঘড়িদাস আমার হাত ধরিয়া করুণ বচনে বলিল,—'শশা, তুই আমাকে বাঁচা, নইলে সুইসাইড হয়ে যাব। যেখান থেকে হোক শ' দেড়েক টাকা যোগাড় করে দে। আমি যেমন করে পারি তিন মাসে শোধ করে দেব।'

শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রেই দেড়শো টাকা সংগ্রহ করিলাম। সংগ্রহ করা খুব সহজ হয় নাই, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে যাক। সুখের বিষয় ঘড়িদাস মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই টাকা শোধ করিয়াছিল, কথার খেলাপ করে নাই।

পরদিন সকালবেলা ঘড়িদাস আবার আসিয়া উপস্থিত। বলিল,—'ভাই, একলা যেতে ভয় করছে, তুইও সঙ্গে চল। সিভিল সার্জন সায়েব শুনেছি কড়া পিত্তির লোক, যদি মার-ধর করে!'

সুতরাং আমিও সঙ্গে গেলাম।

সাহেব-পাড়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশে সিভিল সার্জনের বাংলো। বাগানের মাঝখানে বাড়ি, উর্দি-পরা আর্দালি বেয়ারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা এত্তালা পাঠাইয়া বলিদানের জোড়া পাঁঠার মত ঘোষাল সাহেবের সম্মুখীন হইলাম।

ঘোষাল সাহেব রীতিমত সাহেব, চেহারাও সাহেবের মত। অফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, আমাদের দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া চাহিলেন। ঘড়িদাস আমার পানে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আমি কোনও রকমে বক্তব্যটা বলিয়া ফেলিলাম।

'আমার মেয়ের ঘড়ি চুরি গেছে!' ঘোষাল সাহেবের গৌরবর্ণ মুখ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি টেবিলস্থ ঘণ্টির উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, আর্দালি ছুটিয়া আসিল। তিনি চাপা গর্জনে বলিলেন,—'মিসিবাবাকো বোলাও।'

আর্দালি ছুটিয়া ভিতরে দিকে চলিয়া গেল। ঘোষাল সাহেব ব্যাঘ্র-দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

দুই মিনিট পরে প্রমীলা প্রবেশ করিল। সে বোধহয় সবেমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে; মুখ থম্‌থমে, চোখে ঘুম-ঘুম ভাব, অবিন্যস্ত বেণীর প্রান্তে বিনুনি একটু শিথিল হইয়া আছে। আমদের দিকে একবার অলস কটাক্ষপাত করিয়া বাপের টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল—'কি বাবা?'

ঘোষাল সাহেব আমাদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—'তুমি এদের ঘড়ি মেরামত করতে দিয়েছিলে। আমি তখনি মানা করেছিলাম। তোমার ঘড়ি চুরি গেছে। অন্তত এরা তাই বলছে।'

প্রমীলা আমাদের দিকে ফিরিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল, তারপর আর্ত স্বরে বলিল,—'অ্যাঁ,—চুরি গেছে। সে যে আমার জন্মতিথির ঘড়ি। বাবা।'

ঘোষাল সাহেব তর্জন ছাড়িলেন—'পুলিসে দেব! আমার সঙ্গে চালাকি! ঘড়ি হজম করবে!—এই বেয়ারা!'

আমি মরিয়া হইয়া বলিলাম,—'ঘড়ির দাম ইনি দিতে রাজি আছেন। আপনার মেয়ে বলেছিলেন ঘড়ির দাম দু'শো টাকা। ইনি দু'শো টাকা এনেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। প্রমীলার আর্ত ব্যাকুলতার ভাব আর রহিল না, ঘোষাল সাহেবের রক্ত-চক্ষু নিমেষ মধ্যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। পিতাপুত্রীর মধ্যে একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। তারপর ঘোষাল সাহেব অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন,—'টাকা এনেছ?'

'আজ্ঞে এই যে—' বলিয়া ঘড়িদাস পকেট হইতে টাকা বাহির করিল।

ঘোষাল সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—'রেখে যাও। তোমার কম বয়স তাই এবার ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে সাবধান থেকো। যাও।'

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আমি একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম পিতাপুত্রী পরস্পরের পানে চাহিয়া সানন্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

রাস্তায় চলিতে চলিতে আমার মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। বলিলাম,—'ঘড়িটার দাম বোধহয় দু'শো টাকা নয়, বোধহয় গিল্টি সোনা।'

ঘড়িদাস আমার দিকে তাকাইল না, অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'হুঁ।'

দেখিলাম ঘড়িদাস জানে। সে ঘড়ির কাজ করে, ঘড়ির দাম জানা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বেশী দাম কেন দিল বুঝিলাম না। হয়তো ভাবিয়াছে এ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে লোকে জানিতে পারিবে, তাহার ব্যবসার ক্ষতি হইবে, তাই চাপিয়া গিয়াছে।

যা হোক, এই ঘটনার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম গিয়া বর্ষা আসিয়াছিল, তাহাও বিগত হইয়া শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ক্লাবে থিয়েটারের মহলা আরম্ভ করিয়াছি।

দিন ছয়-সাত ঘড়িদাসের ওখানে যাই নাই, একদিন বিকালে গিয়া দেখি, সে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। বলিলাম,—'একি ঘড়িদা, এই গরমে কম্বল?'

ঘড়িদাস কম্বলের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল—'ম্যালেরিয়া ধরেছে রে শশা' বলিয়া আবার কম্বলে মুখ লুকাইল।

ম্যালেরিয়ার সময় বটে। বলিলাম,—'কবে থেকে ধরেছে?'

ঘড়িদাস কম্বলের ভিতর হইতে বলিল,—'পরশু থেকে।'

'কুইনিন্ খেয়েছ?'

'না।'

আমি তক্তপোষের পাশে গিয়া বসিলাম। জ্বরের ঝোঁকে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছে, এমন কি তক্তপোষটা পর্যন্ত কাঁপিতেছে। বলিলাম,—'খেলে না কেন? দশ গ্রেণ পেটে পড়লেই জ্বরটা বন্ধ হ'ত।'

সে উত্তর দিল না, লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—'তোমার দেখাশোনা করছে কে?'

এবার সে বলিল,—'দেখাশোনা কে করবে? একলাই তিনদিন পড়ে আছি। তুই ছিলি কোথায়?'

থিয়েটার লইয়া মত্ত ছিলাম বলিতে পারিলাম না। বলিলাম,—'আমি কি জানতাম তুমি জ্বরে পড়েছে? যা হোক, তুমি শুয়ে থাকো, আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে আসি।'

সে কম্বল হইতে মুখ বাহির করিল, আরক্ত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—'আমার কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই। মামা পূজোর সময়

টাকা চেয়েছিল, হাতে যা ছিল পাঠিয়ে দিয়েছি। ওষুধের দাম তোকেই দিতে হবে।'

'দেব' বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

আধ ঘণ্টা পরে কুইনিন্-মিক্‌শ্চাররের শিশি, বিস্কুট সাবু বার্লি প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি ঘড়িদাসের কাঁপুনি কমিয়াছে, জ্বর ছাড়িতেছে। তাহাকে এক দাগ মিক্‌শ্চার গিলাইয়া সাবু করিতে বসিলাম। ঘড়িদাসের একটা প্রাচীন ষ্টোভ ছিল।

সন্ধ্যার সময় তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, সে কম্বল ফেলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। গদ্‌গদ স্বরে বলিল,—'তুই না থাকলে আমার কি হ'ত রে শশা?'

বলিলাম,—'শেয়ালে টেনে নিয়ে যেত। এখন একটু নড়ে বসো দেখি, ভাল করে বিছানাটা পেতে দিই। ভারি অপরিষ্কার হয়েছে।'

সে ব্যগ্র হইয়া বলিল,—'না না, কিছু দরকার নেই। তুই এবার বাড়ী যা।'

আমি তাহার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রথমেই মাথার বালিশটা তুলিয়া উল্টাইতে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থিরচক্ষু হইয়া গেলাম। বালিশের তলায় যে-বস্তুটি ছিল তাহা আমার চক্ষু এবং মনকে যুগপৎ ধাঁধিয়া দিল।

প্রমীলা ঘোষালের সোনার ঘড়ি।

'একি, এ যে প্রমীলার ঘড়ি!' বলিয়া আমি ঘড়িটা তুলিয়া লইতে গেলাম।

ঘড়িদাস ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঘড়িটা আমার হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইল। তারপর গুটিশুটি পাকাইয়া বিছানায় শুইয়া মাথায় কম্বল চাপা দিল।

কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। প্রমীলার ঘড়ি চুরি যায় নাই, ঘড়িদাস কম দামী ঘড়ির দু'শো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে। ঘড়ি চুরি গিয়াছে বলিয়া খাসা অভিনয় করিয়াছিল। কিন্তু কেন? কেন?

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি দ্বারের দিকে চলিলাম,—'আচ্ছা চলি। তুমি কিন্তু চমৎকার অভিনয় করতে পার ঘড়িদা।'

ঘড়িদাস কম্বল হইতে মুখ বাহির করিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল,—'শশা, কাউকে বলিস্ নি ভাই।'

সেদিন ঘড়িদাসের অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই। এখন ফ্রয়েড্ পড়িয়া বুঝিয়াছি। সে কুকুর পুষিতে চাহিয়াছিল, পাখী পুষিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না।

ঘড়িদাস যদি বাঁচিয়া থাকে, ঘড়িটা এখনও তাহার কাছে আছে কি? না যৌবনের নেশা যৌবনের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছিল?